হানিমুন

জেমস হেডলি চেজ

BENGALIEBOOK.COM
BE
বেঙ্গলিবুক.কম
bengaliebook.com
বেঙ্গলিবুক.কম
বেঙ্গলিবুক.কম
bengaliebook.com
বেঙ্গলিবুক.কম
★2022★

সূচিপত্র

জীবনের ধ্রুবতারা 2
একটা গোপন ভয় 62
ভিক্টরের সঙ্গে গল্প 142

জীবনের ধ্রুবতারা

০১.

আমার জীবনের ধ্রুবতারা মার্গারেট। একেবারে অসম্ভব আমার ওকে ছাড়া নিজেকে কল্পনা করা। আমি মরে যেতে পারি ওর জন্য অকাতরে। সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারি একটু একটু করে। কারোরই অস্তিত্ব নেই এই মুহূর্তে আমার কাছে মার্গারেট ছাড়া। নেই কোনো কিছুরই। আমি জানি না অন্যায় কাকে বলে। আমি আরো হাজারবার সেই অপরাধ করতে রাজি, মার্গারেটকে ভালবাসাটা যদি আমার অন্যায় কিংবা অপরাধ হয়। বিন্দুমাত্র পাপবোধ নেই আমার মধ্যে। পাগল হয়ে যাই আমি অষ্টাদশী মার্গারেট যখন তার ছিপছিপে যৌন আবেদনময়ী শরীর নিয়ে আমার কাছে আসে। আমি রাজি আছি পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত যেতে যদি ওকে কাছে পাই। ওর সামান্য একটু স্পর্শ পাই, এমনকীনরকে যেতেও দ্বিধা নেই আমার। আমার মার্গারেট আমার একান্ত ভাবেই আমার। অন্য কোনো নারী যে আমার জীবনে আগে আসেনি সেটা কিন্তু ঠিক কথা নয়। আমার সমস্ত সত্ত্বা অধিকার করে নিয়েছে। মার্গারেট আমার জীবনের প্রথম মেয়ে। আমি এমন ভাবে নিজেকে কারো কাছে উৎসর্গ করিনি। ওরই মতো ও। ওর নিজের মত। আমি থামাতে পারি না আমার সংযম যখন ও ওর সাড়ে ৫ ফুট উচ্চতার ফরসা শরীরটা নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন জোয়ার ওঠে আমার রক্তের মধ্যে। নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে যায় তখন আমার সমস্ত সংযমের বাঁধ। আদিমতম জীব হয়ে উঠি তখন আমি।

পিটার আমার নাম। বিখ্যাত এক বছর উনিশশো সতেয়োয় আমি জন্মেছিলাম। বছরটা ছিল রুশ বিপ্লবের। বিট্রিশনাগরিক ছিলেন আমার বাবা। মার্কিনীরক্ত ছিল তার শরীরে। ভারতীয় ছিলেন আমার মা। তিনি ছিলেন বোম্বাই-এর এক অভিজাত পরিবারের মেয়ে। হোটেল ব্যবসা ছিল বাবার লন্ডন শহরে। পরে তিনি ভারতে যান এবং সেখানে বোম্বাইতে একটি হোটেল খোলেন। সোজাসুজি বলা চলে, ভাগ্য ফেরানোর জন্যই তিনি লন্ডন থেকে সুদুর বোম্বে যান। তিনি হোটেল খোলেন বোম্বাইয়ের ইন্ডিয়া গেটের কাছে। সেখানে রাখেন একজন কর্মচারী। প্রায়ই তাকে করতে হত লন্ডন আর বোম্বাই। আমার মা আত্মহত্যা করেন যখন আমার ঠিক দশ বছর বয়স। আমি আজও জানতে পারিনি তিনি যে কেন আত্মহত্যা করেন। মামার বাড়ি বোম্বেতে আমি ছিলাম মা মারা যাবার সময়। মা ছবি হয়ে দেওয়ালে ঝুলছিল যখন আমি ট্রাঙ্ককলে খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছালাম। তার দেহে হঠাৎ আগুন লেগে গিয়েছিল এটা আমি বাবার কাছে শুনলাম। অন্যরকম বক্তব্য ছিল কিন্তু আমার ফ্ল্যাটের প্রতিবেশীদের। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি নিজেই গায়ে আগুন ধরান এটা আমি শুনেছিলাম আমার প্রতিবেশীদের কাছে। বাবা নিজেই মার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন এটা ছিল কারো কারো বক্তব্য। মায়ের আলমারী থেকে মায়ের লেখা একটা চিঠি আমি পেয়েছিলাম অবশ্য পরে। আমার কাছে তাতেই পরিষ্কার হয়ে যায় আত্মহত্যার ব্যাপারটা। তিনি অবশ্য লেখেননি যে কেন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। আমার হৃদয়টা বেদনায় ভরে ওঠে মাকে মনে পড়লেই। আমাকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। মা মারা যাবার পর বাবা দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় মহিলাকে এনে রেখেছিলেন নিজের কাছে। মহিলাটি যে বাবার প্রেমিকা তা আমি একদিন আবিষ্কার করেছিলাম। রীতিমতো যৌন সম্পর্ক ছিল ওর সঙ্গে বাবার। একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। তারপর দরজার একটি ছোটো ফুটো দিয়ে চোখ লাগালাম

কৌতূহলবশতঃ। দেখলাম বাবা উন্মত্তের মতো চুম্বন করছেন সেই মহিলাকে। এক চিলতে পোশাক নেই দুজনের কারো শরীরেই। আমাকে খুবই ভালবাসতেন সেই মহিলা। ওকে ভালই লাগত আমার। এলিজাবেথ নাম ছিল ওঁর। এলিজা বলে ওকে ডাকতেন বাবা। আমি ডাকতাম ওকে মা বলেই। মোটামুটি শিক্ষিতা ছিলেন তিনি। মায়ের রূপের প্রশংসা করতেন তিনি মায়ের ছবি দেখে। যদিও তিনি ব্রিটিশ তবু তার একটা শ্রদ্ধা ছিল ভারত সম্বন্ধে। তিনি সুযোগ পেলে ভারতে যাবেন একথা তিনি প্রায়ই বলতেন। একজন কর্মচারী দেখতেন বোম্বেতে বাবার হোটেলটা। হোটেলটা সক্স গিয়ে দেখাশুনা করবেন এটাই ছিল তার ইচ্ছা। কিন্তু আর হয়ে ওঠেনি সেটা।

নিয়মিত স্কুলে যেতাম আমি। বলা যেতে পারে, যে আমি পড়াশুনাতেও ভালই ছিলাম। আমি স্কুলে পড়তে পড়তেই শেষ করে ফেলেছিলাম শেক্সপিয়ারের সব বই। আমি গোগ্রাসে গিলতাম কীটস, শেলী প্রভৃতির লেখাও। স্কুল থেকে খুব বেশী দূরে ছিল না আমাদের ফ্ল্যাট। যাওয়া আসা করতাম নিজেই। চোদ্দ বছর বয়সে হঠাৎ একদিন ঘুম ভেঙে গেল আমার ভোররাতে। ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার পাজামা ভিজে গেছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, তবে কি প্রস্রাব করে ফেলেছি ঘুমের ঘোরে। কিন্তু দুধের মত সাদা আঠালো পদার্থ আমি হাত দিয়ে দেখলাম। এটা তো প্রস্রাব নয়। ঘটনাটা আমি সম্মাকে বলতে গেলাম, কারণ কিছুই লুকোতাম না আমি ওঁর কাছে। তিনি আমার সব কথা শুনলেন তার পর আমার গাল টিপে বললেন, পিটার, বড়ো হয়ে গেছ এখন তুমি।

পরে আমি এ ব্যাপারে আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারি নি, সে আমাকে জিজ্ঞেস করল। তোর কোন মেয়েকে ভাল লাগে?

কেন, কই না তো।

বছর তিনেকের বড় ছিল আমার চেয়ে বন্ধুটি। এক ক্লাস উঁচুতে পড়ত সে। সে হেসে বলল, একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম কর, সবই বুঝতে পারবি।

করেছিস তুই।

হেসে বলল বন্ধুটি, বান্ধবী একটা আছে আমার। সেরকম কিন্তু কেউ নেই আমার। ভারতে এই সময় চলে গেলেন আমার বাবা। থেকে গেলাম আমি আমার সৎ মায়ের কাছে।

আমার আর কোনো কাজ ছিল না স্কুলে যাওয়া আসা ছাড়া। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতাম। মাঝে মাঝে। ঘুরে বেড়াতাম একাই। একটাই শব্দ আমার কানে ভেসে উঠত বার বার তুই প্রেম কর কারোর সঙ্গে।

একটা দৃশ্য ভেসে উঠত ঠিক তখনই আমার চোখের সামনে। আমার বাবা চুমু খাচ্ছেন আমার সৎমাকে জড়িয়ে। এক ধরনের অস্থিরতা দেখা দিত আমার শরীরে। একদিন স্নান করতে বাথরুমে গিয়ে হস্তমৈথুন করলাম। বন্ধুদের কাছে এর আগে শুনেছিলাম আমি ব্যাপারটা। সেই প্রথম আমার জীবনে, এক ধরনের ঘন পদার্থ। এক আশ্চর্য সুখের অনুভূতি আমার সমস্ত শরীর জুড়েই। সৎমাকে বললাম না। তিন বছর এই একই ভাবে কাটল।

একটি মেয়ের সঙ্গ প্রয়োজন বলে আমার মনে হতে লাগল। সুপ্রসন্ন বলতে হবেআমার ভাগ্য। সৎমায়ের ভাই সঙ্গে একদিন একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলেন। চল্লিশের কোঠায় সআয়ের এই ভাইয়ের বয়স। আমার সমবয়সী মেয়েটির বয়স পনেরো। ক্যাথরিন তার নাম। খুব কাছ থেকে এই প্রথম আমি একটা মেয়েকে দেখলাম। আমরা পরস্পরকে দেখলাম। বলা বাহুল্য ক্যাথরিনের প্রেমে পড়লাম আমি। আমার সারা হৃদয় আনন্দ এবং আবেগে ভরপুর হয়ে উঠল। আমি ছটফট করতে লাগলাম ভেতর ভেতর এক গোপন কামনায়। ভালই আলাপ হল আমার ক্যাথরিনের সঙ্গে। সম্মা চুপ করে রইলেন যদিও তার চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা। তিনি আমাকে কিছু বললেন না। চেহারাটা একটু ভারী ক্যাথরিনের। ফরসা শরীরে দুটো নীলচে চোখ এবং বাদামী ছোট্ট চুলে ওকে অপূর্ব লাগল। তার কথাবার্তা খুবই মিষ্টি। আমরা সবসময়ই গল্প করতাম আমাদের আলাপের পর থেকে। দুজনে আমরা আমাদের ঘর ছাড়া পার্ক কিংবা সমুদ্রের উপকূলে চলে যেতাম। ওর সুডৌল স্তন যা ফ্রকের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে এবং ওর দুটি গভীর চোখ পাগল করে দিত আমাকে। ক্যাথরিন খুব ভালো গান জানত। একদিন আমাকে শোনালো। সে প্রশংসা করত ভারতবর্ষের। সে অবশ্য কিছুই জানতো না ভারত সম্পর্কে। একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করল, রাজা মহারাজা এবং যাদুকরেরা ওখানে থাকেন। রাজ পরিবারের কি মেয়ে ছিলেন তোমার মা?

রাজ পরিবারের নয় কিন্তু অভিজাত পরিবারের। –একটু থামলাম এবং তারপর বললাম, ভারতে যাব আমি বড় হলে, ওখানে আমাদের হোটেল আছে। ওখানে যাওয়ার ইচ্ছা আমার ডাক্তার হওয়ার পর, কি ভাল হবে তো?

হ্যাঁ ভালো হবে।

ক্যাথরিন ঘাড় নাড়লো। একটি বালির ঢিবির আড়ালে আমরা বসেছিলাম সমুদ্রের ধারে। ক্যাথরিনের দিকে একইভাবে তাকাতে আমার দু চোখের ভাষা বুঝতে পারল ক্যাথরিন। চোখদুটো নামিয়ে নিল ও লজ্জায় লাল হয়ে। আমার কোলে সজোরে টেনে নিয়ে চুমু খেলাম আমি ওকে। পরপর পাঁচটা, ওরনরম আঙুরের মত ঠোঁট এমনকী গাল এবং কপাল সবেতেই। ঝড় বয়ে যাচ্ছিল সমুদ্রের ওপর দিয়ে। বসা গেল না বেশীক্ষণ। দুজনে ফিরে এলাম আমরা। আমার দিকে আর তাকাতে পারছিল না ক্যাথরিন। তার দিন দুয়েক পরে আমার সম্মা এবং ভাই কিছু কেনাকাটা করতে গেছেন। বাড়িতে ক্যাথরিন এবং আমি একা।

দুজনে শোবার ঘরে গেলাম। বিছানায় বসেছিল ক্যাথরিন। একটা পাতলা ফ্রক পরেছে আজ সে। পোশাকটি ছিল সাদা রঙের। ওর দুটো নরম স্তন তার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার। রক্ত গরম হয়ে উঠলো আমার শরীরে। আমি পুড়ে যাচ্ছিলাম কামনার আগুনে। ক্যাথরিনের একটা হাত ধরলাম এবং তারপর বললাম, তুমি কি রাগ করেছে?

ক্যাথরিন নাতো বলে মিষ্টি হাসল।

একটা চুমু খাব তোমাকে।

খিল খিল করে হেসে উঠে সে আমার মাথাটাকে দুহাত দিয়ে নিজেই ওর মুখের কাছে নিয়ে এল। নিজেকে রাখতে না পেরে ওকে পাগলের মত চুমু খেতে লাগলাম। তারপর ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ফ্রকটা খুলে দিলাম এবং পরনের প্যান্টিটাও খুলে দিলাম। আমার সামনে শুয়ে আছে নগ্ন ক্যাথরিন। আমি সবে নিজেকে উন্মুক্ত করে ওর ওপর

শুয়েছি, ঠিক সেই সময় দরজায় শব্দ পেলাম। দুজনেই ভয়ে সারা হয়ে পোশাক পরে নিলাম। বারান্দায় চলে গেল ক্যাথরিন পেছনের দরজা দিয়ে। দরজা খুললাম আমি দুরু দুরু বুকে। আমি দরজা খুলে আগত অতিথিকে দেখার পর আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল এবং তারপর ক্যাথরিনকে চীৎকার করে ডেকে বললাম, দেখে যাও কে এসেছে।

ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল ক্যাথরিন দৌড়ে। ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে আমাদের বকতে আরম্ভ করে দিয়েছে আমাদের অতিথি। সে আমাদের প্রিয় পোষা পানিয়েল কুকুর। থাপ্পড় মারলাম ওর গায়ে এবং বলে উঠলাম, তুই শেষপর্যন্ত বদমাইসি করলি টম, ল্যাজ নাড়তে লাগল টম আদর পেয়ে।

আমাদের সেই সুযোগ এসেছিল শেষ মিলনের। ক্যাথরিন চলে গেল এর ঠিক দুদিন পরেই। যাবার দিন যখন একান্তে একবার দেখা হয়েছিল তখন আমি রীতিমতো গম্ভীর হলেও ওর দুচোখে ছিল জল। কে জানে আমি আর আমার প্রেমিকাকে দেখতে পাবো কিনা। আবার কবে আসবে, ওর হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম।

বলতে পারছি না, তবে আমাদের বাড়িতে তুমি যেও।

সারা মুখ ওর চুমুতে ভরিয়ে দিলাম আমি পরম আবেগে। আমার কাছে নিস্তব্ধ মনে হয়েছিল সেই রোদ ঝলমলে সকালটাও। থেমে গেছে তখন দূরে সমুদ্রের গর্জন। ওকে চেপে ধরেছিলাম আমি সজোরে। মুখটা ওর দুটো বুকের মাঝখানে রেখে বলেছিলাম, কিভাবে থাকবো আমি তোমাকে ছাড়া।

কেঁদে বলে উঠল ক্যাথরিন, আমিও তো পারব না পিটার, ওর দেহের সমস্ত সম্পদ যা কিছু লুকোনো আমি আলতো করে ছুঁয়ে দিলাম। আমাকে বারবার বলছিল ক্যাথরিন যে আমাকে ছাড়া ও থাকতে পারবে না।

ক্যাথরিন চলে গেল বেলা দুটো নাগাদ ওর বাবার সঙ্গে। ও আরেকজনকে বিয়ে করেছে পরে শুনলাম। ক্যাথরিনের সঙ্গে আমার আর দেখা না হওয়ার ফলে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। নিজেকে পড়াশুনার মধ্যে ডুবোনো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তখন আমার।

.

০২.

লেখাপড়া এরপর শেষ করলাম এবং তারপর যখন ভালভাবে আমি তাকালাম বাস্তব পৃথিবীর দিকে তখন আমি পাশ করে গেছি ডাক্তারি। ক্যাথরিনের কথা আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সেই মেয়ে অন্য একজনকে কি করে বিয়ে করতে পারে যে মেয়ে যাবার সময় আমায় কত কথা বলে যায়। সাময়িক উচ্ছ্বাস আর আবেগ কি সমস্ত ব্যাপারটাই তাহলে। তাহলে কি ব্যাখ্যা সত্যিকারের প্রেমের? ইতিমধ্যেই আমার বাবার হোটেলের পাশে আমি চেম্বার করেছি। রোগীও হচ্ছে এবং বেশ পশারও জমে গেছে। আমি হার্ট স্পেশালিস্ট, তাই বেশির ভাগ রোগীই হার্টের। এই মহিলাও সেই হার্টেরই রোগী। আপনার সমস্যা কি আমাকে বলুন, তাকে জিজ্ঞেস করলাম পরীক্ষা করবার সময়। সুন্দরী রোগিনী কটাক্ষ হেনে বললো, একটু কাজ করলেই হাঁপিয়ে উঠি এবং

আমার বুক ধড়ফড় করে সবসময়। ওর বুক পিঠ স্টেথিসকোপ দিয়ে দেখে প্রেশার মাপলাম। সবই ঠিক। হেসে ওষুধের প্রেসক্রিপশান লিখে দিলাম এবং বললাম, আপনার কিছুই হয়নি, আপনি ভাল করে খাওয়া দাওয়া করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মহিলাটির নাম সোফিয়া এবং তিনি মাঝারী উচ্চতার। তার নীল চোখ দিয়ে উপচে পড়ছে কামনা। ভারী স্তন দুটি তার চেহারা চেয়ে। তার বাবা পেশায় অধ্যাপক। সোফিয়া চলে গেল সেদিন। আবার কিছুদিন পরে এল। পরীক্ষা করে বুঝলামমনে হয় ওরসমস্যাটা বুকে। তার দুচোখে ইঙ্গিত বহন করছে যে সে আমার প্রেমে পড়েছে। তাকে বললাম, আপনার আর না এলেও চলবে সোফিয়া, কোনো অসুখ নেই আপনার।

আপনি ডাক্তার না ছাই, আপনার কোনো অসুখ ধরার ক্ষমতা নেই সোফিয়া কথাটা বলল কপট বিরক্তির সঙ্গে।

আমি তোমার বাড়ি একদিন যাব, কারণ আমি তোমার অসুখ ধরতে পেরেছি, আমি হেসে বলে উঠলাম।

সোফিয়া উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কবে যাবেন আমাদের বাড়ি।

সোফিয়ার চমৎকার সাজানো গোছানো বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম। ওর অধ্যাপক বাবা মিঃ জিওফ ডেক্সটার খুবই চমৎকার এবং ইংরাজী সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তি। ওঁর অসাধারণ দখল পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যে। অধ্যাপককে বেশ ভালই লাগল। ওর স্ত্রী বছর দুয়েক আগে মারা গেছেন। সোফিয়াই এখন একমাত্র অবলম্বন। জমে গেল আমাদের আলাপ এবং আমি ওকে কথা প্রসঙ্গে বললাম, ভারতীয় মহিলা ছিলেন আমার মা।

তিনি শুনে অবাক হলেন এবং আনন্দিত দুটোই। তিনি বললেন, ভারতকে খুবই শ্রদ্ধা করি আমি। আমার একবার যাবারও ইচ্ছা আছে যদি পারি।

সোফিয়ার সঙ্গে বেশি দিন প্রেম করলাম না আমি এটাই বলা বাহুল্য। ব্যর্থ প্রেমের সেই বেদনাদায়ক স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেল। বিয়ে করে ফেললাম সোফিয়াকে মাস দুয়েক পরেই। একেবারে সংসার জীবন যাপন করব সেটাই মনে মনে ভাবলাম। আমার মনে অমন এক রঙিন স্বপ্ন যা আমি দুচোখে দেখছি। বেশ ভালভাবেই কাটল বিবাহিত জীবনের প্রথম মাসকটি। একটা সমস্যা দেখা দিল তারপর থেকেই। আর পাঁচটা স্থির মেয়ের মত নয় সোফিয়া। ওর ভেতরে সবসময় কিরকম যেন একটা অস্থিরতা। তৃপ্তি যেন নেই কোনো কিছুতেই। সোফিয়া একেবারে সেই রকম যা বোঝায় দেহ সর্বস্ব নারী বলতে। কোনো চেষ্টাই ওর মধ্যে নেই যা দিয়ে আমাকে ও বুঝতে পারবে। সবচেয়ে ব্যস্ততম পেশা ডাক্তারি পেশা হলেও আমি কিন্তু ওকে বেশ সময় দিতাম। রাতের বেলা একদিন সবে খাওয়া দাওয়া শেষ করেছি এবং তারপর বারান্দার চেয়ারে। বসে আছি, ঠিক সেই সময় ও একটি নাইট গাউন পরে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। দুটো পরিপূর্ণ নিটোল স্তন প্রকট হয়ে উঠেছে তার গাউনের ভিতর দিয়ে। তুমি আমাকে আর আগের মত ভালবাসো না, সে আমার একটা কাঁধে হাত রেখে বলে উঠল।

আমি অবশ্য এর আগেও শুনেছি ওর এই ধরনের ছেলেমানুষি এবং অপরিণত কথাবার্তা। যখন তখন ওকে নিয়ে বিছানায় যাওয়াই হচ্ছে ওর ভালবাসার অর্থ। বাইরে স্বাভাবিক কিন্তু ভেতরে রেগে গিয়ে বললাম, আমাকে বলতো আমি শুনি, কিভাবে ভালবাসতে হবে।

ও রেগে গেল কথাটা শুনে, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না ওর রাগের কারণ। আমার সামনে এসে দাঁড়াল নিজের নাইটিটা একটানে খুলে ফেলে দিয়ে। বাঘিনীর মতো চোখ দুটো জ্বলছিল এবং বলে উঠল, তোমার কি পছন্দ হচ্ছে না আমার শরীরটা।

আমি বললাম, চল শোবে চল, সোফিয়া কি হচ্ছে। বিছানায় নিয়ে গিয়ে ওকে শুইয়ে দিলাম টানতে টানতে কিন্তু আমার সমস্ত পোশাক ও খুলে দিয়েছেততক্ষণে নগ্নআমি একেবারে। বুঝলাম ওর চোখের ভাষাতেই যে ও কি চায়। মোটেই ইচ্ছা করছিল না, আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম। ও নিজের বুকের উপর আমার একটা হাত রেখে উন্মাদের মত ক্রমাগত চুমু খেতে লাগল। ওর শরীরের দাবী কিন্তু আমি মেটাতে পারলাম না। এটাই ছিল সবচেয়ে দুঃখের বিষয়। আমি অবসন্ন হয়ে পড়লাম ও তৃপ্তি পাবার আগেই। ও সহানুভূতি জানানো দূরে থাক, আমার অসহায় অবস্থাতে রেগে ফুঁসে উঠে বলল, আমার ভালো মন্দ বোঝার কোনো ক্ষমতা নেই তোমার। কারণ তুমি নিজে একটা জানোয়ার।

আমি চুপচাপ শুয়ে রইলাম গম্ভীর হয়ে। আমার তখন কিছু বলার মত মনের অবস্থা নেই। ও দুহাতে আমার চুলের মুঠি চেপে ধরল এবং তারপর বলল, নপুংশক, তুমি কেন আমাকে বিয়ে করেছিলে।

নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে ওর গালে একটা সজোরে চড় কষিয়ে বলে উঠলাম, বুঝিনি তোমাকে তখন এবং সেটাই আমার একটা মস্ত ভুল, আমি কথাটা বললাম দাঁত চেপে।

ওর সঙ্গে আমার কথা বন্ধ হল তারপর থেকে। কথা বলতাম না প্রয়োজন ছাড়া এবং কেউ কাউকে ছুঁতাম না পাশাপাশি শুলেও। আমি ভেতর ভেতর অসহায় বোধ করতাম যদিও আমি একজন ডাক্তার। আমি ওকে কাছে ডাকলে যদি তৃপ্তি দিতে পারি সেই ভয়ে এবং কিছুটা ঘৃণাতেও আমি ওকে দূরে সরিয়ে রাখতাম। ক্রমশঃ সোফিয়াও অন্যরকম হতে লাগল। ওকে আমি একদিন বললাম, অনেকদিন কোথাও যাওনি, একদিন যাও, বাবার কাছে ঘুরে এস।

সোফিয়া প্রতিবাদ না করে জিনিষপত্র গোছগাছ করে বাবার কাছে চলে গেল। ওর একটি চিঠি পেলাম মাসখানেক পরে। ও ডিভোর্স চায় তাতে লেখা ছিল। ও ভালবাসে ওর চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের ছোটো ওর বাবার এক ছাত্রকে। এবং তাকেই ও বিয়ে করবে।

আমি স্থির হয়ে রইলাম চিঠিখানা পড়ার পরে। ভেবেছিলাম ও ফিরে আসার পরে ওর সঙ্গে একটা মীমাংসা করে নেব। এটা আমার একটা কর্তব্য স্বামী হিসাবে। আমার মন থেকে এক নিমেষেই সব কিছু শেষ হয়ে গেল এই চিঠিটা পড়ার পরেই। ভাবতেই পারি নি সোফিয়া শেষ পর্যন্ত এতদূর এগিয়েছে। আমার কিছু করার ছিল না তখন কারণ তার উগ্র যৌন ক্ষিদেই তাকে এ ধরনের স্বৈরিণীকরে তুলেছে। চিঠি পাঠিয়ে দিলাম বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মতি জানিয়ে। সোফিয়ার মাও সোফিয়ার জন্মের পর অন্য এক পুরুষের সঙ্গে চলে গিয়েছিল এটা পরে অধ্যাপক বাবার কাছে শুনেছিলাম। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই রক্তই সোফিয়া বহন করে চলেছে।

আবার নিঃসঙ্গ লাগল সোফিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর। আমাকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছিল প্রচণ্ড একটা মানসিক অস্থিরতা। বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর কাছে সুখী হব এটা ভেবেছিলাম আমি যেহেতু যৌবনের প্রারম্ভে প্রথম প্রেমে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু তাও হল না এবং আবার ব্যর্থ হলাম। আমার ওপর বুঝি ঈশ্বরের অভিশাপ আছে। লন্ডনে আর থাকবে না এটাই ঠিক করলাম। তখন বুঝি লজ্জার শেষ থাকবে না যদি কোনোদিন সোফিয়ার মুখোমুখি হয়ে যাই। ক্যাথরিনের কথা মনে এল এবং ভাবলাম কি বলবো ওকে যদি হঠাৎই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ও আমাকে চিনতে কি পারবে। আমি তীব্র একাকীত্বে ছটফট করতে লাগলাম। আমার জীবন চলল এইভাবেই, নিজের চেম্বারে যাওয়া সকালে, তারপর দুপুরে খাওয়াদাওয়া এবং বিশ্রাম করে, বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত রোগী দেখা। এক মাঝবয়সী পরিচারিককা জোনিসকে নিয়োগ করেছিলাম, সে ছিল খুবই সরল এবং খুবই ভাল ছিল তার রান্নার হাতটি। এক ধরনের মাতৃত্বের স্বাদ পেতাম ওর মধ্যে, এটা আমি বলতে পারি। আমি একজন পুরুষ মানুষ এটা যতই হোক। একটা শারীরিক চাহিদা আছে আমার। আমি প্রেম বা বিয়ে করব এ দুটোর কোনোটাই ভাবতে পারতাম না। প্রেম এবং বিবাহিত জীবন সবই ব্যর্থ। আমার মত দুঃখী পুরুষ খুব কমই আছে।

একটা পানশালায় মদ খেতে খেতে হঠাৎ একদিন আলাপ হল মেরিলিনের সঙ্গে। এই হোটেলেরই একজন বেশ্যা মেরিলিন। সে মোটেইনমনীয় নয় যদিও খুবই সুন্দরী। কেবল ছলাকলা দেখিয়ে পুরুষমানুষকে গ্রাস করে ফেলার মতলব সারাক্ষণই। একটি ছোট্ট ঘর যা ছিল হোটেলের একপ্রান্তে সেখানে নিয়ে গেল সে আমাকে। তখন রীতিমতো উত্তেজিত আমি। ঘরে একটি দামী খাট এবং ড্রেসিং টেবিল। মেরিলিন আমাকে জড়িয়ে ধরতেই আমি চুমু খেতে লাগলাম ওকে উন্মাদের মত। আমরা দুজনে পৌঁছে গেলাম

উত্তেজনার চরমে। মেরিলিন ছটফট করছে এটা আমি বুঝতে পারলাম উত্তেজনার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়ে। ওর এবং আমার দুজনেরই মুখে গোঙানি কারণ কেউই সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি ওর প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দিলাম মিলন শেষ হবার পরে। ও ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল, পিটার আবার তুমি কবে আসবে?

এই প্রথম আমি আনন্দ পেয়েছি এবং ওকেও আমি আনন্দ দিতে পেরেছি এবং আমি যে অক্ষম নই তাও বুঝতে পারছি। আমি শারীরিকভাবে রীতিমতো সুস্থ এবং যৌনগ্রন্থিগুলি এখনও তাহলে অকেজো হয় নি আমার। আমি দেহ মনে সম্পূর্ণ সুস্থ হলেও এক ধরনের মানসিক ভয় থেকেই আমি সুখী করতে পারিনি সোফিয়াকে।

বাড়িতে ফিরে এসে চেয়ারে বসা মাত্রই এক ধরনের অবসাদ নেমে এল আমার সারাটা শরীর ঘিরে। বোধ করলাম একটি বিষণ্ণতা। আমার শারীরিক আকাঙ্খা মেটাতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত স্ত্রী নয়, প্রেমিকা নয় একটি বেশ্যার কাছে। দুনিয়াতে বুঝি বা খুব কমই আছে আমার মত হতভাগ্য পুরুষ। ভাল লাগছিলনা লন্ডনে, তাই ভাবছিলাম কিছুদিনের জন্য কাটিয়ে আসি কোনো জায়গাতে। নিউইয়র্কে সোজা চলে এসে একটি হোটেলে এসে উঠলাম। নানা ধরনের চিন্তাভাবনা মাথায় জট পাকিয়ে আসে ছোট ছিমছাম ঘরটায় এসে শুলে। আমি মোটেই সুখী হতে পারলাম না সাংসারিক জীবনে। আমি ছুটে বেরিয়েছি চিরকালটাই ভালবাসার খোঁজে। আমি পাইনি ভালবাসা এবং একজন নারীকে আমি চিনতে পারি নি ডাক্তার এবং বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করবার পরেও। একজন নির্বোধ মহিলাকে শেষপর্যন্ত বিয়ে করেছি শিক্ষিত হয়েও। পারিনি তাকে যাচাই করতে। অক্ষমতা এটাই কারণ যদি নির্বাচনে ভুল করি তাহলে কিরকম বিপর্যয় নেমে আসে মানুষের জীবনে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমিই।

এই সময়টা বেশ গরম নিউইয়র্কে। রাস্তায় লোকজনের যাতায়াত কিছুটা কম ছিল তখন। আমার কাছে খুব একটা খারাপ লাগলো না প্রাকৃতিক পরিবেশ। এক ডাক্তার বন্ধু ছিল আমার। তার নাম ছিল মাইক। আমার অসহায় অবস্থার কথা আমি জানালাম মাইককে। মন দিয়ে সবকিছু শুনল মাইক এবং তারপর বলল, পিটার, তুমি এখানেই থাক এবং একটা চেম্বার খুলে বসে যাও এখানে। কথাটা আমার মনে ধরাতে ভাবলাম তাই করব, এখন কিছুদিন ভেবে বরং একটা সিদ্ধান্ত নেব।

আমি কিছুদিন ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম নিউইয়র্কের বিভিন্ন রাস্তায়। রোগী দেখা শুরু করলাম শেষ পর্যন্ত ওখানেই চেম্বার করে। আমি একেবারে কাজের মধ্যে ডুবে গেলাম এবং তার মধ্যে কোনদিক দিয়ে যে দশ বছর কেটে গেল তা খেয়ালই করলাম না। সুন্দরী মহিলাদের মুখ দেখলেই আমার ক্যথরিনের কথা কিংবা সোফিয়ার কথা মনে পড়ে যেত এবং এক ধরনের বিষাদ নেমে আসত তখন আমার সারা শরীর জুড়েই। একজন কর্মচারী রেখেছিলাম লন্ডনের হোটেলে। হোটেল ব্যবসা আমার দুটো জায়গা বোম্বে এবং লন্ডনে মোটামুটি ভালই চলছিল। বোম্বেতে গেলে কেমন হয়, হঠাৎ একবার আমার মনে হল। বোম্বেতে সেই ছেলেবেলার পর আর যাওয়া হয়নি। ওদিককার সঙ্গে সব সম্পর্ক অবশ্য শেষ হয়ে গিয়েছে মা মারা যাবার পর। কারণ মায়ের মা তার কয়েক বছরের মধ্যে মারা গিয়েছিলেন এবং আরো আগে মায়ের বাবা। মা ছাড়া এক ভাইও তার ছিল। কলকাতায় চলে গিয়ে সেই ভদ্রলোক আইনের ব্যবসা করেন বোম্বের পাঠ চুকিয়ে। যদিও তার ঠিকানা জানি না। বোম্বেতে গেলে প্রথমেই একটা ফ্ল্যাটের দরকার হবে। কারণ আমার কর্মচারীরা হোটেলেই থাকে। আর দেরীকরলাম না, সোজা ভারতে পৌঁছালাম প্যান আমেরিককান বিমানে। আমার কাছে স্বপ্নের দেশ ছিল

ভারতবর্ষ। আমার কর্মচারী যেন কাছাকাছি ভাল একটি হোটেল ঘর বুক করে রেখে দেয়, তা আমি আগেই খবর দিয়ে রেখেছিলাম। আমি সেখানে গিয়ে উঠলাম কারণ সে আগেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ভারতীয় খ্রীস্টান ছিল। কর্মচারীটা। ভদ্রলোককে বললাম আমি, একটা ফ্ল্যাট দরকার আমার এখানে, আপনি ব্যবস্থা করুন, কোনোক্রমে থাকতে পারলেই আমার চলবে, তার মধ্যে আমি বরং কিছুদিন দিল্লী ঘুরে আসি। দিল্লীতে সোজা চলে এলাম ওকে সব দায়িত্ব দিয়েই। সেখান থেকে তাজমহল দেখতে আগ্রায়। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের অমর স্মৃতি হিসাবে রয়েছে সেখানে এক বিশাল প্রাসাদ। পাশাপাশি রয়েছে স্বামী এবং স্ত্রীর কবর। সেই প্রাচীন আর মহান নিদর্শনের দিকে আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। আমার মাথা নত হয়ে এল সম্রাটের প্রতি প্রেমে শ্রদ্ধায়। এরকম প্রেম এলো না কেন আমার জীবনে। ভালবাসা দিয়ে আমি কেন সুখী করতে পারলাম না স্ত্রীকে। এক ধরনের গভীর বিষাদ আমার সমস্ত শরীরে নেমে এল তাজমহল দেখতে দেখতে। বোম্বেতে আবার ফিরে এলাম। বোম্বের উপকণ্ঠ বান্দ্রায় আমার জন্য আমার এক কর্মচারী বাড়ি দেখে রেখেছে। এক বিধবা ভদ্রমহিলা তার ভাইঝিকে নিয়ে ঐ বাড়িতে থাকে। তার আর কেউ নেই। মিসেস হ্যারিয়েট মুর ভদ্রমহিলার নাম। মার্গারেট ওর অষ্টাদশী ভাইঝির নাম।

.

০৩.

মিসেস হ্যারিয়েট মুরের বাড়িতে আমার কর্মচারীই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। বান্দ্রার এদিককার বাড়িগুলো বেশ সাজানো গোছানো এবং সৌখিন। এদিকটায়

বেশিরভাগ ধনী লোকেরা বাস করে কর্মচারীরা জানালো। ছোটখাট ছিমছাম বাড়ি দুধের মত সাদা রঙের। কুকুরের চিৎকার শোনা গেল ভেতরে বেল টিপতেই। একজোড়া চটির শব্দ সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল। যিনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি মাঝবয়সী এক ভদ্রমহিলা, চল্লিশের কাছাকাছি তার বয়স। রুপোলী ঝিলিক তার চুলের এদিক ওদিক। সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে সেই চিহ্ন যৌবনে তিনি যে অত্যধিক সুন্দরী ছিলেন। তার স্তন দুটো বিশেষ করে কারণ, আমি খুব কমই দেখেছি এমন নিটোল স্তন। আমাকে একবার দেখলেন ভদ্রমহিলা, তারপর মৃদু হেসে আমার কর্মচারীকে বললেন, ডাঃ পিটার ব্রাউন তাহলে আপনিই।

নমস্কার করলাম আমি মৃদু হেসে এবং তারপর বললাম, হ্যাঁ, তবে আমি ডাক্তার নই, আমি মিস্টার।

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, আমি দুঃখিত, তারপর বললেন, আসুন ওপরে, আমার নাম হ্যারিয়েট মুর।

আমি কর্মচারীকে চলে যেতে বলার পর ভদ্রলোক চলে গেলেন। তিনি পরেছিলেন সাদার উপর গোলাপীনক্সাওয়ালা একটি স্কার্ট। দোতলায় ওর বসার ঘরে তিনি আমাকে নিয়ে বসালেন। একটা চেয়ারে বসে ঘরের সর্বত্র একটি রুচির ছাপ দেখলাম। একটি সুদৃশ আলমারী রয়েছে বড় খাট ছাড়াও, প্রভু যীশুর ছবি দেয়ালে এবং তার সঙ্গে টাঙানো আরেকটি মিষ্টি মেয়ের ছবি। সোফায় বসলেন মিসেসমুর। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন আপনাকে নিচের ঘরটা দেব, সেইটাই খালি আছে, আপনার পছন্দ হবে তো আমাদের বাড়িটা। ঘাড় নাড়লাম আমি এবং ঠিক করলাম আপাতত এখানেই থাকবে।

কোনো অসুবিধা হবে না আপনার। এটা বোম্বের অভিজাত এলাকা এবং এখানে সবরকমই সুবিধা হবে, বললেন মিসেস মুর।

হঠাৎ পুরনো কথা মনে পড়ল আমার। ডাক্তার হয়ে ভারতে যাব একথা আমি ক্যথরিনকে বলেছিলাম। নিজেকে নিয়োগ করেছিলাম ওখানকার মানুষের সেবায়। মনে মনে ভাবলাম, লন্ডন এবং এখানকার ছোট্ট হোটেল বিক্রি করে দিয়ে একটা চেম্বার খুলবো। মিসেস মুরকে জানালাম এই পরিকল্পনার কথাটা। তিনি আনন্দিত হয়ে বলে উঠলেন, আপনার পেছনে আমি আছি এবং এটা খুব ভাল কথা। তিনি এরপর দেখিয়ে দিলেন আমার ঘরটা।

নিজের অতীতের কথা মিসেস মুর শোনালেন রাতে খেতে বসে। তিনি বলে উঠলেন, আমার স্বামী প্রথম হেনরী মুর। তিনি আমাকে ছেড়ে চলে যান বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যে। কোনো সন্তান নেই তার। আমি জানি না ইংল্যান্ডে তিনি এখন কোথায় আছেন। ভারতে আমি ওর সঙ্গেই এসেছিলাম।

আপনার ঘরের টাঙানো রয়েছে যে মেয়ের ছবিটি ওটি কার?

মিসেস মুর হেসে জবাব দিলেন, ও আমার ভাইঝি, বলতে পারেন বড়ই দুর্ভাগা।

জিজ্ঞেস করলাম কেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মুর, এখানকার এক মহিলাকে বিয়ে করেছিল আমার ভাই, ওঁদেরই মেয়ে মার্গারেট। ওর বাবা মা দুজনেই মারা যান ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে ওর যখন দুবছর বয়স ঠিক তখন। ও আমার কাছেই মানুষ সেই থেকে।

এখন ও কোথায় আছে?

মিসেস মুর বললেন, ও স্কুল থেকে গেছে এক্সকারসানে, পনের দিন পর ফিরবে এবং ও থাকে পাশের ঘরটায়।

মন আমার বারবার অতীতে ফিরে যাচ্ছিল এই ছবিটাকে দেখার পরই। আমার ক্যাথরিনের কথা মনে পড়ছিল। আমার প্রথম প্রেমিকাই নতুন করে আমার কাছে হাজির হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছিল। ছটফট করতে লাগল আমার ভেতরটা ওকে দেখার জন্য। এই প্রথম টের পেলাম আমার ভেতরকার অস্থিরতা। বাগানে গেলাম খাওয়া দাওয়ার পর। আমার চারদিকে গাছপালা এবং মাথার উপর ছাদ। আমার জীবনে এর আগে এমন রোমান্টিক পরিবেশ দেখিনি।

মিঃ ব্রাউন কি ভাবছেন–মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস মুর।

পরিবেশ খুব সুন্দর, খুব ভাল লাগছে, আর কিছু নয়।

মিসেস মুর হাসলেন এবং আমি তাকিয়ে দেখলাম ওঁর দিকে। রহস্যের আভাস দুচোখে। মিসেস মুরের দুচোখে বয়স ভেদ করে আবার কি আসতে চাইছে রমণীর চিরন্ত পিপাসা।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব মিসেস মুর–ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

কি বলুন।

মিঃ মুরের পর আপনার কাছে আর কোন পুরুষ আসেনি–আমি বলে উঠলাম।

তিনি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তারপর বললেন, একটি প্রয়োজনের অছিলায় মিঃ মুর হঠাৎ ইংল্যান্ড চলে গিয়েছিলেন। ওর একটি চিঠি পাই তার কিছুদিন পরেই। এখানে আর ফিরবেন না, এই বলে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ে করেছেন ওখানে তিনি একজনকে। বোঝাতে পারব না আমি কি আঘাত যে ওতে পেয়েছিলাম। তিনি একটু থেমে আবার বললেন, আমি সবাইকে বলেছি যে তিনি মারা গেছেন একটি কঠিন অসুখে। আমাকে সবাই বিধবা বলে জানে সেই থেকেই। ভারতের একটি সংস্কার হল, যে এখানে বিধবাদের আলাদাভাবে জীবন যাপন করতে হয়। এই সংস্কার নেই আমাদের ওখানে। নিজেকে আমার বেশ নিঃসঙ্গ লাগত। তখন এই বাচ্চা মেয়ে মার্গারেট ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। মিমি ছিল ওর ডাক নাম। ওকে ভরাট করার চেষ্টা করছি আমার জীবনের ফাঁকগুলি দিয়ে। ওকে নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই কারণ পড়াশুনোয় খুব ভাল মেয়ে মিমি।

সামান্য একটু থেমে মিসেস মুর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমি একভাবে তাকিয়ে ছিলাম বাগানের গাছপালাগুলোর দিকে। আমার কানে এল মিসেস মুরের কণ্ঠস্বর, বছর বাইশ–তেইশ বয়স তখন আমার। খুব ভেঙে পড়েছি তখন স্বামীকে হারিয়ে। একজনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। ঠিক সেই সময়েই। পঞ্চাশের কাছাকাছি তার বয়স। তিনি

ওকালতি করেন বোম্বের হাইকোর্টে। মনে প্রাণে ভারতীয়। দীর্ঘদিন মেলামেশা করলেন তিনি আমার সঙ্গে। বলা যায় আমি ওর প্রেমে পড়ে গেলাম যদিও ওর আমার মধ্যে বয়সের একটা পার্থক্য রয়েছে। ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিলামও একসময়। বিধবা বিয়েতে রাজি নন এটা তিনি জানিয়েছিলেন চিঠিতে, কেন জানি না। কারণ আমি যে বিধবা তা আমি ওঁকে জানিয়েছিলাম। তিনি কলকাতায় চলে গেছেন এটা আমি পরে শুনেছিলাম। আর খবর পাইনি কোনো, মিঃ ব্রাউন আমার ভাগ্য সত্যিই খারাপ।

মিসেস মুরের গলা ধরে এল এবং জল চিক্ চিক্ করতে লাগল তার দুচোখের কোণে। মিসেস মুর, এই বলে আমি তার পিঠে একটা হাত রাখলাম।

তিনি মৃদু হাসলেন এবং চোখের জল মুছে বলে উঠলেন, আপনাকে বিব্রত করে ফেলেছি ডাঃ ব্রাউন এবং এজন্য আমি খুবই দুঃখিত।

না না, সেরকম কিছু নয়। চলুন আপনার মেয়ের ঘরে যাই।

তিনি মার্গারেটের ঘরের দিকে এগোলেন আমাকে নিয়ে। খুব ছিমছাম ধরনের ছোটো ঘর, সেখানে রয়েছে একটি ছোটো খাট। ওর বাবা এবং মার একটি ছবি রয়েছে দেওয়ালে টাঙানো। আর একটি ছবি পড়াশুনোর টেবিলে রাখা রয়েছে। মার্গারেটের এখনকার তোলা ছবি, তাকিয়ে রইলাম একভাবে মার্গারেটের ছবির দিকে। এই নারী যেন অনন্তকাল ধরে আমার পরিচিত একথা আমার মনে হল। বারবার এই ছবিটার মধ্য দিয়ে ক্যাথরিন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। রহস্যে ঘেরা সৌন্দর্যময় মিষ্টি

মুখের সেই ছবিটি আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মিসেস মুর বললেন, ভারী দুরন্ত স্বভাবের মেয়ে মার্গারেট। আমি যখন যা বলব ঠিক উল্টো করবে।

কিছু না বলে আমি হাসলাম। আবার বললেন মিসেস মুর, পড়াশুনোয় খুব ভাল তবে মিমি। আপনি বুঝতে পারবেন ওর সঙ্গে আলাপ করে। জ্বালিয়ে মারবে আপনাকে।

আমি মৃদু হেসে বললাম, তা জ্বালাক না। তখন ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে আমার মনের গোপন ইচ্ছা। জ্বলতেই তো চাই আমি। আমার রক্তে আমি একটি তীব্র উন্মাদনা বোধ করলাম আবার যৌবনের প্রান্তসীমায় এসে। আমি আবার মিসেস মুরের দিকে তাকালাম। কি ছিল কি জানে আমার দুচোখের মধ্যে। মিসেস মুর এবার মুখটা নামিয়ে নিলেন।

.

০৪.

কেটে গেছে এর মধ্যে নটা দিন। এখানে ভালই কাটছে মোটামুটি। মিসেস মুরের কোনোরকম আপত্তি নেই ওর নীচের তলার বৈঠকখানায় আমি যদি আমার চেম্বার করি। মিসেস মুরকে নিয়ে দশদিনের মাথায় একটু ঘুরে এলাম। আমাকে বারবার উন্মনা করে দিচ্ছিল গাড়িতে মিসেস মুরের স্পর্শ। এখনও মিসেস মুরের সর্বাঙ্গে যথেষ্ট যৌবন। ওর দিকে তাকালাম আমি গাড়ির মধ্যে ওর একটা হাত আমার হাতের উপর নিয়ে। মৃদু মৃদু হাসলেন মিসেস মুর, কিন্তু তিনি হাত সরিয়ে নিলেন না। সন্ধ্যে হয়ে গেছে তখন যখন বাইরে কিছু কেনাকাটা করে ঘরে ফিরলাম। বিশ্রাম নিচ্ছিলাম আমি তখন আমার ঘরে

বসে। আমার ঘরে মিসেস মুর এলেন ঘণ্টাখানেক পরে। আমি শুয়েছিলাম, তাই তিনি আমার পাশে বসলেন বিছানার উপরে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস মুর, ডাঃ ব্রাউন আপনি নিশ্চয় এখন খুব ক্লান্ত বোধ করছেন।

না না। আমার রীতিমতো অভ্যাস আছে ঘোরাফেরা করা, মিসেস আপনি চিন্তিত হবেন না অত।

আমার একটা হাত ধরলেন মিসেস মুর। তারপর বললেন, আমি খুব খুশী হব আপনি আমাকে যদি হ্যারিয়েট বলে ডাকেন, আপনি আমার বন্ধু, এই কথা তিনি একটু থেমে আবার বললেন।

আমি হেসে বললাম, ঠিক আছে আমরা তাহলে পরস্পরের বন্ধু।

এবার তুমিতে নামলাম আপনি থেকে। পিটার বলেই তুমি আমাকে ডেকো হ্যারিয়েট, আমি একথা বলে উঠলাম।

হাসল হ্যারিয়েট। বেশ সুন্দর লাগে ওকে হাসলে। সৌন্দর্যময়ী এবং ব্যক্তিত্বময়ী হ্যারিয়েট। একটা হাত রাখলো আমার কপালে হারিয়েট। নিজেকে আমি সংযত রাখলাম কোনোক্রমে। যদিও আমার রক্তে দোলা লাগল। হ্যারিয়েট নিজে থেকে আমাকে এরপর চুমু খেল ঘণ্টা দুয়েক পরে। তারপর বলে উঠল, এখন খেয়ে নেওয়া যাক চল।

বারান্দায় গিয়ে আমরা দেখলাম যে সামান্য মেঘ জমেছে আকাশে এবং হাওয়ার বেগ কম। খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম দুজনে একসঙ্গেই। যে যার নিজস্ব ঘরে তারপর চলে

গেলাম। মৃদু হাসলো হ্যারিয়েট এবং আমাকে একটা চুমু খেল যাবার সময়। কিন্তু আর না দাঁড়িয়ে ওপরে উঠে গেল সোজা সিঁড়ি বেয়ে। তাকিয়ে রইলাম ওর যাওয়ার দিকে এবং দেখলাম যে ওঁর হাঁটার ছন্দ বেশ সুন্দর। আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না ও মিলিয়ে যায়। বারবার শিহরণ লাগছিল আমার রক্তে। নারী সঙ্গ আমি একেবারেই পাইনি গত কয়েক বছর। বেশ্যাদের সঙ্গে অবশ্য রাত কাটিয়েছি মাঝে মাঝে নিউইয়র্কে, খুবই সাময়িক অবশ্য সেই ব্যাপারটা। একটি তীব্র অবসাদ নেমে আসত তারপরেই আমার সারাটা শরীর জুড়ে। প্রেমিকা ক্যাথরিন এবং স্ত্রী সোফিয়ার কথা মনে পড়ত অসহায় তখন আমি। একটি ভীষণ অস্থিরতা বোধ করতাম তখন। একসময়ে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি দিনের পর দিন। অস্বাভাবিক ব্যবহার করেছি আমি আমার বন্ধু এবং পরিচিত জনের সঙ্গে মাঝে মাঝে। আমার মাথায় কোনোরকম গোলমাল হয়েছে একথাই তারা ভাবত। তারা আবার বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত রীতিমতো স্বাভাবিক ব্যবহার করাতে। বুঝতে পারতোনা তারা আমাকে। একদিন আমার বন্ধু মাইক নিউইয়র্কে থাকার সময় বলল, তুমি একজন সাইক্রিয়াট্রিস্টকে দেখাও পিটার, তোমার মধ্যে একটা গোলমাল হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম মাইককে, আমার মধ্যে কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এটা তোমার মনে হল কেন?

মাইক জবাব দিল, ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছো তুমি আজকাল প্রায়ই, আবার বললো একটু থেমে, অনেক কমে গেছে তোমার স্মরণ শক্তি আজকাল, ভালো কথা বলছি আমি তোমাকে। তোমাকে ভাল পরামর্শ দেওয়াটা আমার কর্তব্য তোমার বন্ধু হিসাবে, এটা আমি মনে করি।

দেখি, সবই বুঝলাম তোমার কথাটা।

এক মানসিক রোগের ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম মাইকের কথামতো কিছুদিনের জন্য। আমাকে কিছুদিনের মধ্যেই ভদ্রলোক সারিয়ে দেন, এটা আমার খুবই সৌভাগ্য বলতে হবে। আমার পেশার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হত ব্যাপারটা যদি বেড়ে যেত। নিজেকে পুরোদমে আমি এরপর ডুবিয়ে দিয়েছিলাম ডাক্তারীতে। ডাক্তারীতে এরপর ডুবে যাবার পর আমি নারীদের ভীষণভাবে এড়িয়ে চলতাম। একশো হাত দূরে রাখতাম আমি বেশ্যাদের। মিসেস হ্যারিয়েট মুর, সেই মহিলা যার সঙ্গে আমার দীর্ঘকাল পরে ঘনিষ্ঠতা হল। রমণী হ্যারিয়েট স্বামী পরিত্যক্তা প্রেমে রীতিমতোব্যর্থ। আমার সঙ্গে হ্যারিয়েটের মিল এটা বলা বাহুল্য। আমিতো স্ত্রী পরিত্যক্ত এবং প্রেমে ব্যর্থ একটি হতভাগ্য পুরুষ। আমার বিছানায় ছটফট করে কাটলো সারা রাত, কারণ আমার ঘুম আসছিল না কিছুতেই। হ্যারিয়েট আমার কাছে আসবে এটা আমি আশা করছিলাম প্রতিমুহূর্তে এবং একটি উন্মাদনা যেন রয়েছে আমার রক্তে। আমার আশা পূর্ণ হল না কিন্তু এইভাবেই আমার সারাটা রাত কেটে গেল। কে জানেহ্যারিয়েট তবে কি দ্বিধাগ্রস্ত! ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ভোররাতে এবং ঘুম ভাঙল ঠিক বেলানটায়। চারদিক ঝলমল করছে রোদে। আমি উঠেবসলাম হ্যারিয়েটের ডাকে। হ্যারিয়েট চায়ের প্লেট এবং সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে টেবিলের উপর রাখল। পিটার তুমি তো ঘুমোও না এত বেলা অবধি, তবে কি তোমার শরীর খারাপ হ্যারিয়েট হেসে বলল।

শরীর ঠিক আছে, এই বলে হেসে বাথরুমে ঢুকলাম। টেবিলে মুখ টুখ ধুয়ে বসে চায়ে চুমুক দিলাম। আমার কপালে হাত রাখলো হ্যারিয়েট। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, আমি, আরে কোনো চিন্তার কারণ নেই, আমি ঠিক আছি।

চা শেষ করলাম, এই মুহূর্তে বেশ জোরে সাগরের হাওয়া বইছিল, আমার মনের ভেতর তীব্র ঝড় বয়ে দিচ্ছিল তীব্র বেগের সেই হাওয়া। আমি জিজ্ঞেস করলাম হ্যারিয়েটকে, দিন তিনেক বাদেই ফিরছে মার্গারেট।

হ্যাঁ, চায়ে চুমুক দিয়ে হ্যারিয়েট বলল, তবে তোমাকে ও শান্তিতে থাকতে দেবে না কারণ ও খুবই চঞ্চল।

সজোরে হেসে উঠেআমি হারিয়েটের দিকে তাকালাম ভালভাবে। ওর রঙীন গাউনের ভিতর দিয়ে আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছিল সাদা রঙের সেই মোহময়ীবুকজোড়া, বেশ আকর্ষণীয় বলা যায় হ্যারিয়েটের দেহের গঠন এবং সেই কারণেই ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠছিল শরীরের রক্ত। রীতিমতো ঝাঁ ঝাঁ করছিল কান দুটো। আমি বুঝি একেবারে উন্মাদ হয়ে যাব একথা আমার খালি মনে হচ্ছিল। তবু সংযত রাখার চেষ্টা করলাম নিজেকে যথাযথ। হ্যারিয়েট নিজে থেকেই এগিয়ে আসুক এটাই আমি চাইছিলাম। এর জন্যে ক্ষতি নেই আমাকে অপেক্ষা করতে হলেও। কিন্তু ও যদি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তাহলে কি হবে? আমি তো শিউরে উঠলাম ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে। সত্যিই অসম্ভব আমার পক্ষে হ্যারিয়েটকে বিয়ে করা।

মার্গারেট আসার আগের দিন রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা ঘরে শুয়ে আছি। বাইরে অন্ধকার কারণ রাত তখন এগারোটা। একটানীলচে রঙের মৃদু আলো জ্বলছে ঘরের মধ্যে। একটা সিগারেট খাচ্ছিলাম বিছানায় আধশোওয়া হয়ে। প্রচণ্ড অস্থিরতা মনের মধ্যে কারণ কাল মার্গারেট আসবে। আমাকে কিভাবে নেবে তা কে জানে। মিমি, মিমি, আমি উচ্চারণ করছিলাম এই নামটা খালি মনের মধ্যে। হ্যারিয়েট ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। সেই স্বচ্ছ সাদা রঙের গাউন পরনে। মুখের দিকে তাকালাম ওঁর। আমার পাশে এসে বসল হ্যারিয়েট। কি ভাবছে পিটার, সে বলে উঠল আমার একটা হাত ধরে।

তোমার কথাই ভাবছি হ্যারিয়েট। আমি বলে উঠলাম মৃদু হাসি দিয়ে।

হ্যারিয়েট সজোরে হেসে উঠে বলল, আমার সৌভাগ্য, ওর স্তন দুটো দুলে উঠল ওর হাসির দোলায়। আমি সেদিকে তাকিয়ে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারছিলাম না। ওকে নিজের কোলে টেনে নিলাম ওর একটা হাত ধরে। ওর ঠোঁটে, গালে, সর্বাঙ্গে পাগলের মত চুমু খেতে লাগলাম। দোলা লেগেছে হারিয়েটের রক্তে। ফিসফিস করে বলে উঠলো পিটার আমি আর পারছি না, আমাকে তুমি ছিঁড়ে খুঁড়ে শেষ করে দাও।

আমার হাতের স্পর্শে সজাগ হয়ে উঠেছে ওর নরম বুক। আজ ফেটে পড়তে চাইছে বহুদিনের জমানোকামনা। ঘরের এক কোণে ওর গাউনটা খুলে ফেলে দিলাম। ঘরের মধ্যে জ্বলছে মৃদুনীলচে আলো এবং বিন্দুমাত্র পোশাক নেই তখন আমার শরীরেও। অন্ধকার বাইরেটা এবং তার মধ্যে জানলার পর্দাগুলো বাতাসে উড়ছিল, ক্রমশঃ বাড়ছিল যেন হাওয়ার বেগ। আমরা ডুবে যাচ্ছিলাম স্বর্গীয় সেই পরম সুখের গভীরে একটু একটু

করে। জানি না কখন যে উন্মাদনা শেষ করে ক্লান্ত দেহে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঠিক ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙে দেখি হ্যারিয়েট নেই। টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা ছোট্টকাগজ রয়েছে পেপার ওয়েট চাপা দেওয়া। খুলে দেখি তাতে লেখা রয়েছে, তোমাকে আমি আমার সারা জীবনের সঙ্গী হিসাবে পেতে চাই পিটার, তুমি আমার সব কিছু, আমাকে তুমি বিয়ে করবে তো?

মাথাটা গরম হয়ে গেল চিঠিটা পড়েই। ওটাকে মুড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিলাম আমি জানালা দিয়ে। অসম্ভব, একথা আমি নিজের মনেই বিড় বিড় করে বললাম। মার্গারেটের মুখ তখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

.

০৫.

ঠিক দুপুর বারোটার সময় নিজেকে বাগানের একটি চেয়ারের মধ্যে বসে.খবরের কাগজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। আমার কাছে বেশ ভালই লেগে গেছে বোম্বেশহরটা। এখনকার স্বাধীন ভারতবর্ষ ঘুরে দেখার ইচ্ছা আছে। এ দেশের কাছে সারা পৃথিবীর অনেক প্রত্যাশা। আমাকে মুগ্ধ করেছে এর প্রাচীন দর্শন, ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি। এ দেশের কতত বিরাট এবং পুরনো সভ্যতা। এই ভারতবর্ষ মহান। .আমি মোটেই ভারত বিদ্বেষী নই, বিশলিং কিংবা আর অন্য পাঁচটা ইংরেজের মত। ডাক্তারীকরব আমি এখানেই। বাকী জীবনটা আমি কাটিয়ে দেবো এখানকার জনসাধারণের সেবাতেই। আমি

হারিয়েটের চিঠির উত্তর দিইনি। বারকয়েক দেখা হয়েছে ওঁর সঙ্গে। আমার চিঠি পড়েছে, একবার জিজ্ঞেস করেছিল।

হু, সংক্ষেপে জবাব দিলাম আমি ঘাড় নেড়ে।

মার্গারেটকে আমি দেখিনি আজ পর্যন্ত, ও আসছে আজই একটা মেয়ে আঠারো বছরের। তবু বুক ধুকপুক করছিল আমার ওরই জন্য। আমি যেন অনন্তকাল ধরে চিনি মার্গারেটকে। আমার কাছে একটা পবিত্র সত্ত্বা যেন মিমি। আমি কি ওর প্রেমে পড়ে গেলাম, এটা আমি ওকে না দেখেই ভাবলাম। একবার চেষ্টা করলাম খবরের কাগজটা মন দিয়ে পড়বার। মন বসছিল না যেন কিছুতেই। বারবার ঝাপসা হয়ে আসছিল চোখের সামনের অক্ষরগুলো। একটা গাড়ীর শব্দে আমার চমক ভাঙলো হঠাৎ। ভেতর থেকে একটা মেয়ে নামল এটা দেখলাম। রঙ খুব ফর্সা নয় এবং ছিপছিপে মাঝারী উচ্চতার চেহারা। একটু বাদামী ভাব। আমার কাছে হ্যারিয়েট ওকে নিয়ে এলো। মার্গারেট আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমার কাছে এখন রক্ত মাংসের নারী মার্গারেট, যে ছিল এতদিনের ছবি। ওর কাছে আমার পরিচয় দিল হ্যারিয়েট। হেসে উঠল মার্গারেট খিলখিল করে। তারপর নমস্কার করলো আমাকে। দুষ্টুমির ঝিলিক ওর চোখ দুটোয়। আমি ক্রমশঃ তলিয়ে যেতে লাগলাম ওর সেই কালো আর টানা চোখের গভীরে। মিমি, তুই গল্প কর মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে, আমি খাবার নিয়ে আসি, হ্যারিয়েট বলে উঠল।

চলে গেল হ্যারিয়েট। পিটার তোমার রেহাই নেই, সে যাবার সময় বললো মৃদু হেসে।

আমি হেসে উঠে জিজ্ঞেস করলাম ওকে, কি ধরনের বই পড়তে ভাল লাগে তোমার?

মার্গারেট প্রস্তুত ছিল না ঠিক এই ধরনের প্রশ্নের জন্য। সে ঘাবড়ে গেল প্রথমটা এবং তারপর হেসে উঠল খিলখিল করে। সে বলে উঠল, আমি সবধরনের বই পড়ি। আমি প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে। সবকিছু পড়া ভালই তো, তাই না।

হেসে উঠল তারপর খিল খিল করে এবং বলে উঠল, কি বলে ডাকব আমি তোমাকে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে ওর রহস্যময় চোখে সমুদ্রের গভীরতা। ওর নিটোল বুক দুটো ওঠানামা করছিল হাসির চোটে। একে না হলে আমার চলবে না, এটাই আমি ভাবতে লাগলাম। আমি অপেক্ষা করছি যেন জন্মজন্মান্তর ধরে এই নারীর জন্যেই, নরকে যেতে কোনো ভয় নেই আমার এই জন্যে। বললাম, তোমার মায়ের বন্ধু আমি, পিটার বলে ডাকে তোমার মা আমায়, তোমারও বন্ধু হতে চাই আমি, তুমি কি বল।

তোমাকে তাহলে আমিও পিটার বলে ডাকব সে থামিয়ে দিয়ে বলল। হেসে উঠল আবার ও এই কথা বলে। আমার শরীরের ভেতর রক্তের দোলা বাড়ছিল। খাবার পরিবেশন করতে লাগল হ্যারিয়েট। মার্গারেটের দিকে তাকাচ্ছিলাম আমিবারবার। আমার কৈশোর বয়সের কথা মনে পড়ে গেল ওকে দেখামাত্রই। ক্যাথরিনের কথা মনে পড়ছিল এবং মোচড় দিয়ে উঠছিল আমার বুকের ভেতরটা। আবার সেই যৌবনের প্রারম্ভে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছিল। আমার দিকে তাকিয়ে মার্গারেট বলল, তাজমহল দেখতে নিয়ে যাবে আমাকে?

আমি বললাম, যাব নিশ্চয়ই, বাইরে নিজেকে সংযত রাখলাম যদিও ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিলাম। সেই যৌবনের প্রারম্ভে মাঝে মাঝে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছিল।

হ্যারিয়েটকে মা বলে ডাকে মার্গারেট পিসীমার বদলে। বললো, সবাই তাজমহল দেখে আসি চলো মা।

মিমি এখন খেয়ে নাও ঠিক আছে যাওয়া যাবে। ওর মাথায় হাত দিয়ে একথা বললো হ্যারিয়েট। খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলাম এবং মাঝে মাঝে আমি তাকাচ্ছিলাম মার্গারেটের দিকে। সামান্য মেঘ জমেছে আকাশে এবং কিছুটা রৌদ্র মান হয়েছে। বৃষ্টি হয় মাঝে মাঝে গরমকালের এই সময়টা। এখন হ্যারিয়েট নেই, তাই পায়ের গোড়ালিতে হাত রেখে একটু ঝুঁকে বললো মার্গারেট। আবার কি কামড়ালো আমায়।

আমি চেয়ার থেকে উঠে গেলাম মার্গারেটের চীৎকারে এবং ওর গোড়ালিতে হাত দিয়ে দেখতে লাগলাম। চুপচাপ বসেছিল মার্গারেট কিন্তু আমার ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না ওর পাটা। হাত বুলোতে লাগলাম বেশ খানিকক্ষণ ধরে, বলে উঠলাম এখন কমেছে মার্গারেট।

খিলখিল করে হেসে বলল মার্গারেট, কিছুতো আমাকে কামড়ায়নি। দুষ্টমীর ঝিলিক ওর দুচোখে। আমি এবার ওর একটা হাত ধরে বললাম, কি হচ্ছে, বদমাইসী।

আমার পেটের কাছে টেনে আনলাম ওঁর মাথাটা এই কথা বলেই। এক হাতে ওর চিবুকটা তুলে নিয়ে মুখটাকে তুলে ধরলাম, আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল ও। আমি এর আগে কোনো নারীর এমন মিষ্টি হাসি দেখিনি। ওর গালে টোল পড়ে হাসলে। আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে পারি এই জন্য এবং হাঁটতে পারি এর জন্য হাজার মাইল। আমি টিপে দিলাম ওর গালটা এবং ওর জিভের সঙ্গে ঠেকালাম নিজের জিভটা বের

করে। নিজেকে তার আগেই ছাড়িয়ে নিয়ে আমার কাছ থেকে দৌড় লাগাল মার্গারেট। হ্যারিয়েট ঠিক সেই মুহূর্তে এসে হেসে বলে উঠল, পিটার ও তোমাকে খুব বিরক্ত করছে না।

–না না, আমার খুব ভাল লাগছে ওর ছটফটে স্বভাবটা, কারণ আমি সহ্য করতে পারি না কোনো গোমড়া মুখে মেয়েকে।

হ্যারিয়েট মৃদু হেসে বলল, ওর মন এখনও সেই বারো তেরো বছরে রয়েছে যদিও বয়স ওর আঠারো পেরিয়ে গেছে। ও কিন্তু এখনও এতটুকু গম্ভীর হতে শেখেনি।

ও গম্ভীর হলেই বরঞ্চ বুড়িয়ে যাবে। মৃদু হাসলো হ্যারিয়েট। বলে উঠল, তুমি বুড়োটে মেয়েদের একেবারেই পছন্দ কর না। কিন্তু ওদিকেই তো এগিয়ে চলছে তোমার বয়সটা।

হ্যারিয়েট, বয়স হলেও আমি এখনও রীতিমতো যুবক, আমি হ্যারিয়েটের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলাম।

হ্যারিয়েট রহস্য মাখানো হাসি হেসে বলল, আমি তো সেই পরিচয় পেয়েছিলাম সেদিন রাতেই। চোখের দিকে তাকালাম হ্যারিয়েটের এবং দেখলাম সেই চোখে ভালগার ইঙ্গিত। আতঙ্কে শিউরে উঠলাম আমি ভেতর ভেতর। আমি ভাবতেই পারছি না হ্যারিয়েটকে বিয়ে করার ব্যাপারটা। মার্গারেট, আমার মিমি, আমার ছোটো মিমি এখন রয়েছে আমার সমস্ত মন জুড়ে। ও অষ্টাদশী। আমি সারা জীবন থাকতে চাই ওর ওই নরম নিটোল বুকের মাঝখানে মাথা দিয়ে।

হঠাৎ আমার একটা হাতের উপর হাত রেখে হ্যারিয়েট বলে উঠল, পিটার কি ভাবলে তুমি আমাদের ব্যাপারটা।

শিউরে উঠলাম আমি এবং ভাবলাম ঠিক এই মুহূর্তে ওঁকে চটিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এ বাড়ির পাট তাহলে চুকিয়ে ফেলতে হবে আমাকে। আমার পক্ষে সেটা একটা আত্মহত্যার সামিল হবে। আমার কাছ থেকে তাহলে সারা জীবনের মত হারিয়ে যাবে মার্গারেট। আমি সেটা কিছুতেই পারবনা সহ্য করতে। তাই বললাম, আমি ভেবেছি তোমাকে বিয়ে করার ব্যাপারটা। আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে এই যা যে একটু দেরী হবে। ঠিক এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। হ্যারিয়েটের দুচোখে উদ্বেগ ফুটে উঠল এবং সে বলে উঠল, পিটার কিন্তু এর কারণ কি?

এখানে আসলে আমি একটু গুছিয়ে বসতে চাই। চেম্বার খোলার ইচ্ছা আছে আমার। রোগী দেখব খুব কম পয়সায়। এমন কি বিনা পয়সাতেও, আমি শ্রদ্ধা করি ভারতকে। এখানকার মানুষ জনেদের কাজে লাগলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব আমি আমার ছেলেবেলায় মাকে কথাটা বলতে, শুনে খুব খুশী হয়েছিলেন মা।

হ্যারিয়েট বলে উঠল, ঠিক আছে, এই বলার পর একটি দীর্ঘশ্বাস বেরোলো তার বুক থেকে। অনেকক্ষণ চুপচাপ আমি এবং হ্যারিয়েট বসে থাকার পর এক সময় দেখলাম মার্গারেট গম্ভীর মুখে আমাদের দিকে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে।

.

০৬.

এরপর দিন দশেক কেটে গেছে। মার্গারেট একটু যেন আমাকে এড়িয়ে চলছিল। সেদিন রাত আটটার সময় নিজের ঘরেই বসেছিলাম আমি। বই পড়ছিলাম একটি চেয়ারে বসে। এটির বিষয় হচ্ছে নরনারীর যৌন জীবন। রাত দশটার আগে ডিনার হয় না.তাই ডিনারে বসতে আজ এখনও অনেক দেরী। হ্যারিয়েট রান্নাঘরে রীতিমতো ব্যস্ত। এক কাপ চা দিয়ে গেছেহ্যারিয়েট ঘণ্টাখানেক আগে। আমি চাইনি কিন্তু ও নিজে থেকেই চুমু দিয়েছিল, কিন্তু তাতে আমি আপত্তি করি নি। কিন্তু ওকে পাল্টা টেনে ধরে চুমু আমি খাই নি। কি করছে নিজের ঘরে মার্গারেট কে জানে। ভেজানো ছিল আমার ঘরের দরজাটা। আমার সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে রইল হঠাৎ সিঁড়িতে একটা পায়ের শব্দ পেয়ে। দরজা খুলে হঠাৎ ঘরে ঢুকলো মার্গারেট। আমার বুকটা ছ্যাৎকরে উঠল ওকে দেখা মাত্রই। খুব আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমার পেছনে থেমে গেল ও। একটা রঙীন পাতলা ফ্রক ওর গায়ে। ওর কোমল স্তন দুটো ভালভাবেই দেখা যাচ্ছে পাতলা ফ্রকের ভিতর দিয়ে। আমার চোখে পড়ল ওর সবুজ রঙের প্যান্টিটা। ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছিল আমার বুকের স্পন্দন। বই পড়তে লাগলাম তবু আমি নিজেকে যথাযথ সংযত রেখে। একটা অধ্যায় রয়েছেনরনারীর যৌনমিলনের উপর। আমার কাছে এগিয়ে এসে মার্গারেট একেবারে আমার কাঁধে হাত রাখলো। ওর কুণ্ঠা আমি বুঝতে পারলাম। আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না ওর হাতের স্পর্শ পেয়ে। কোমরটা জড়িয়ে ধরলাম ওর একটা হাত দিয়ে। বই পড়তে লাগলাম সেই অবস্থাতেই। ও সরে গেল না। কী বই পড়ছে, ও জিজ্ঞেস করলো।

আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম, বিজ্ঞানের বই। এবারে ও একটু ঝুঁকে পড়ল। আমার শরীরে ঠেকলো ওর স্তনটা একবার। ওর কোমর থেকে আমার হাতটা আর একটু নীচে নেমে গেছে। দেখি বলে ও একটু ঝুঁকল।

কিছুক্ষণ দেখল এই বলে এবং তারপর আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। সে বলে উঠল, কি অসভ্য বই। একটা ফোটো ওর চোখে পড়েছে যা ছিল নরনারীর মিলনের ওপর। চেপে ধরে আছি ওকে আমি। প্রচণ্ড উত্তেজনা তখন ভেতরে। আমি ওকে টেনে নিয়ে কোলের ওপর বসালাম যখন ও নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে, মৃদু হাসলাম, কেন, কোথায়, দেখলে অসভ্য ব্যাপারটা?

মার্গারেট হেসে বলল, বইতেই তো রয়েছে, টেবিলের একধারে আমি রেখে দিলাম বইটাকে মুড়ে। একটি নরনারীর মিলনের ছবি রয়েছে মলাটে। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য থেকে নেওয়া হয়েছে ছবিটি। গঠন শৈলী খুবই অপূর্ব এবং এমন শিল্পসম্মত কাজ সত্যিই খুব কম দেখা যায়। বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল মার্গারেট ছবিটার দিকে। হাত দিয়েই আছি আমি ওর কোমরে। ওর শরীর ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠছে এটা আমি বুঝতে পারলাম। আমার কোলে বসালাম ওকে আমি আলতো করে টেনে নিয়ে। তুমি কি পড়বে বইটা, আমি বললাম এই কথাটা।

ছেলেমানুষী ভঙ্গী নিয়ে ও ঘাড়টা নেড়ে বলে উঠল, হ্যাঁ।

ঠিক আছে, আমি ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, যদি তুমি পড়াশুনা ভাল করে কর তাহলে আমি তোমাকে দেবো।

আমি কোনোরকমে সংযত রাখতে পারছিলাম না নিজেকে। চুমুতে অস্থির করে তুলব বলে ভাবছিলাম। হ্যারিয়েট যেকোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে বলে সাহস হচ্ছিল না। আমার ঠোঁটের সামনে টেনে আনলাম ওর চোয়ালটা একহাতে ধরে, একটা চুমু খেলাম তারপর গভীর ভাবে। তখন বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে যাচ্ছিল আমার শরীরে। মার্গারেট আমার কোল থেকে ছিটকে উঠে দাঁড়ালো আমি আর একটা চুমু খাবার আগেই। বিষয় ওর চোখ দুটো। ঠোঁটটা একবার মুছলো হাতের পিছন দিয়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তারপর একছুটে। আমি বসে রইলাম হতভম্ব হয়ে। কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছিল না আমার ব্যাপারটা। আমি বেশ ঘাবড়ে গেছি মার্গারেটের অদ্ভুত আচরণে। বলবেনা তো ও হ্যারিয়েটকে। উল্টে রাখলাম বইটা এবং হ্যারিয়েট ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো তার মিনিট পাঁচেক বাদেই। সে এসে বসলো আমার সামনের চেয়ারটায়। তোমাকে একটু আগে মিমি বিরক্ত করছিল না, সে একথা বললে মৃদু হেসে।

একবার ঢোক গিললাম আমি। না তো, তারপর কোনোক্রমে বললাম।

হ্যারিয়েট বলে উঠল, কিছুতেই ও আজকাল পড়াশুনা করতে চায় না। বড্ড বদমাশ হয়ে গেছে।

টেবিলের ওপর বইটা হাতে নিয়ে ও দেখতে আরম্ভ করলো পাতা উল্টে। কিন্তু খানিকক্ষণ বাদে বলল, তোমাকে ও আর মানবে না, ওকে তুমি বেশি আদর দিও না।

আমি ঘামছিলাম এতক্ষণ। ঘামটা শুকোচ্ছে বলে এবার মনে হল। পাখাটা ঘুরছিল যে মাথার উপর তা আমি এতক্ষণ টের পাইনি। এবার টের পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ওর মাকে

তাহলে বলেনি ব্যাপারটা মার্গারেট। আমার সামনে এসে দাঁড়াল হ্যারিয়েট। কাঁধে রাখলো তার দুটি হাত। আমাকে উত্তেজিত করে গেছে মার্গারেট আগেই। এখনো কাটেনি তার রেশ। ঘরের দরজায় আমি উঠে গিয়ে খিল লাগিয়ে দিলাম। হ্যারিয়েটের গাউনটা খুলে চেয়ারের মাথায় রেখে দিলাম ওকে একটা চুমু খেয়ে। হ্যারিয়েটকে পাথরের মূর্তির মত লাগছিল সম্পূর্ণ নগ্ন শরীরে। বিছানাতে নিয়ে গেলাম আমি ওকে সোজা কোলে করে এবং তারপর নিভিয়ে দিলাম আলোটা।

দিন সাতেক কেটে গেছে তারপর। সমুদ্র উপকূলে বেরিয়ে এলাম একদিন হ্যারিয়েট, আমি। আর মার্গারেট। ভাল করে কথা বলছে না ইদানীং আমার সঙ্গে। বাগানে বসেছিলাম এবং তখন সবে বিকেল হয়েছে। একটি টেবিলে পত্রিকা পড়েছিল তখন আমার সামনে। পত্রিকাটা আমার নয়। ওটা একটি মেয়েদের পত্রিকা এবং হ্যারিয়েট ওটা নিয়মিত পড়ে। পত্রিকাটি উল্টে পাল্টে দেখে আমি রেখে দিয়েছি। এর মধ্যে আমি পড়ে ফেলেছি একটি বিখ্যাত লেখিকার গল্প। প্রথমে অশ্লীল মনে হলেও পড়ে দেখলাম যে ভদ্রমহিলা ঠিকমতো লিখতে পারেন নি এবং কাহিনীটা অশ্লীল নয়। কাহিনীটা সংক্ষেপে বলা হল যে, বিপ্লবী দল যাতে রয়েছে তিনজন সশস্ত্র বিপ্লবী তারা লুকিয়ে আছে গোপন একটা ডেরায়। ওদের খোঁজে চারিদিকে তোলপাড় করছে পুলিশ। একজন নারী এবং দুজন পুরুষ রয়েছে ওদের মধ্যে। মেয়েটি ঐ দুজনের মধ্যে একজনকে ভালবাসলেও দেহ দিলো আরেকজনকে। এটাই ছিল কাহিনীর বিষয়বস্তু। পত্রিকার পাতাগুলি কিন্তু হাওয়ায় উড়ছিল। হ্যারিয়েট চা দিয়ে গেছে একটু আগে। চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম আস্তে আস্তে। হঠাৎ দেখলাম মার্গারেট একটা বই হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে এবং আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। চা খেয়ে যাচ্ছিলাম আমি ওকে না দেখার ভান করে। আমাকে বললো মার্গারেট, ঐ রকম বই তুমি পড়ো কেন সবসময়?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিরকম বই।

কোনো জবাব দিল না মার্গারেট, সে শুধু একবার তাকালো টেবিলের পত্রিকার উপর। ও কি বলতে চাইছে তা আমি বুঝতে পারলাম। আমি তাই হেসে বললাম, ওটা আমার নয়, ওটা তোমার মায়ের।

চেয়ারে বসে পড়লো মার্গারেট। তুমি মায়ের সঙ্গে মিশবে না, একথা হঠাৎ সে বলে উঠল অসন্তুটি ভঙ্গীতে।

মার্গারেট বলেটা কী? আমিতো শুনে রীতিমতো অবাক। বলে উঠলাম, ছিঃ ওসব কথা বলতে নেই মায়ের সম্পর্কে।

এবার রেগে গিয়ে মার্গারেট আমার কোলে ছুঁড়ে মারল ওরবইটা। তারপর বলে উঠল ঝাঁঝিয়ে, তুমি তাই করবে যা আমি বলছি।

এই বলে ও আর না দাঁড়িয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল ছুটে। স্থির হয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। ও চলে যাবার পর আমি কোল থেকে বইটা নিলাম এবং ওপরটা দেখলাম। এটা একটি কমিসের বই। পোষা কুকুরটা ছাড়া পেয়ে আমার পায়ের কাছে এসে ল্যাজ নাড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। হ্যারিয়েট আমার সামনে এসে বসল কিছুক্ষণ পরে। মুখটা ওর খুবই গম্ভীর। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মেঘের আনাগোনা। কি হলো হ্যারিয়েট, জিজ্ঞেস করলাম আমি।

হ্যারিয়েট বলে উঠল বিরক্তি মাখা স্বরে, পিটার আর বলো না, কি বলবো তোমায়, মিমি যে কি কথার অবাধ্য, লীতে ওর স্কার্ট দুটো দিয়ে আসতে বললাম, এতই একগুঁয়ে যে কিছুতেই গেল না। বলে কি, তুমি গল্প করবে আর আমি যাবো, তাই আমি ভাবছি কি যে, আমি ওকে বোর্ডিং এ পাঠিয়ে দেবো।

কেঁপে উঠলাম আমি, এ হতেই পারে না। আমার কাছে সমস্ত কিছু অন্ধকার হয়ে যাবে যদি মার্গারেট আমার চোখের সামনে না থাকে। কিছুতেই আমি বাঁচবো না।

.

০৭.

সকাল দশটা, সেদিন হ্যারিয়েট বাড়িতে ছিল না। কোনো দরকারে গেছে হয়তো। যাবার সময় বলে গেছে ফিরতে ঘণ্টা দুয়েক দেরী হবে। আমি বই পড়ছিলাম আমার ঘরে বসে। রেডিওতে খবর হচ্ছিল, কিন্তু আমি আসলে পড়ছিলামও না এবং শুনছিলামও না। আমি মার্গারেটের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলাম। ওকখন আসে তা প্রতি মুহূর্তেই আশাকরে ছিলাম। দরজাটা ভেজানো রয়েছে। হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে আমার বুকটা কেঁপেউঠল। আমার কাছেই আসছে কি তবে আমার প্রেমিকা। বসে রইলাম আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে এবং দরজার সামনে এসে থেমে গেল পায়ের শব্দ। মিনিটখানেক কাটার পর আমার দরজাটা একটু একটু করে খুলে ঘরে ঢুকলো মার্গারেট। আবার ভেজিয়ে দিলো দরজাটা ঠিক তেমন ভাবেই। একেবারে আমার সামনে এগিয়ে এসে

দাঁড়ালো, হাসিমুখে। আমি ওর একটা হাত ধরাতে, খানিকটা এগিয়ে এলো ও। তোমার মা কোথায়, আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ব্যাঙ্কে ও জবাব দিল।

ব্যাঙ্কে গেছে, সেকি? তবে যে বললো আজ কার বাড়ি যাবে। মার্গারেট আমার প্রশ্নের জবাবে বলল, হ্যাঁ ব্যাংকের পাশেই এরিনা আন্টির বাড়ি যাবে।

বেশ দেরি হবে তো তাহলে।

মার্গারেট জবাব দিল, হ্যাঁ ব্যাংকে আজ তো একটু ভিড় হবে, তাই দেরী তো হবেই।

মার্গারেটকে কাছে টেনে নিয়েছি কথা বলতে বলতেই। ওর গায়ে একটা রঙীন পাতলা ফ্রক। ভেতরে কিছু নেই বলেই আমার চোখে পরিষ্কার ধরা দিচ্ছিল ওর দেহের অনুপম সৌন্দর্য। আমি ওকে জড়িয়ে ধরতে ও আর বাধা দিল না। ওর ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল এবং আমার সমস্ত চেতনা অসাড় হয়ে গিয়ে আমি তখন আর আমাতে ছিলাম না। একটার পর একটা বিস্ফোরণ ঘটছে মাথার উপর। মার্গারেট তুমি রাগ করেছে, আমি বলে উঠলাম অস্ফুটে।

বিড় বিড় করে ও বলে উঠল, কই নাতো। আমি চুমু খেতে লাগলাম ওর নরম আঙুরের মত ঠোঁটে, পাগলের মতো। আমার সোনামনি মিমি, একথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, আজ আর থাকবেনাবুঝি কোনোবাধাই। ওর ফ্রকের উপর দিয়ে শুনে আমার হাত চলে যাচ্ছে বারবার। বারবার ও সেই সঙ্গে অস্ফুট শব্দ করছিল। ওর পুরো ফ্রকটাই

খুলে দিয়ে একসময় আমি হাত দিলাম ওর উরু সন্ধিতে। আমি একেবারে উন্মাদ হয়ে গেলাম ওর লোমহীন উরুতে হাত বোলাতে বোলাতে। ওর পাখির মত নরম দেহটাকে তুলে নিয়ে বিছানায় গেলাম এবং আমার শরীর তখন উত্তেজনায় কাঁপছিল। দরজার বেলটা ঠিক তখনই বেজে উঠল যেই মাত্র আমি ওর পরম গোপন সম্পদের সঙ্গে আমার নিজের সংযোগ ঘটিয়েছি আমার সমস্ত উত্তেজনা শেষ ঠিক তখনই। ফ্রক পরে নিয়েছে মার্গারেট। আমি ওকে ওর নিজের ঘরে চলে যেতে বললাম এবং তারপর এগিয়ে গেলাম বাড়ির সদর দরজার দিকে। এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য, হ্যারিয়েট দাঁড়িয়ে আছে এক ভদ্রলোকের কাঁধে হাত দিয়ে। মুখ যন্ত্রণায় নীল এবং ব্যান্ডেজ রয়েছে পায়ে। আমার ঘরের বিছানাতেই শুইয়ে দিল ভদ্রলোক ওকে নিয়ে গিয়ে। কিভাবে ঘটলো, আমি জিজ্ঞেস করলাম। রাস্তায় প্রচণ্ড জোরে একটা সাইকেল ওকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয়। জবাব দিলেন ভদ্রলোক।

যন্ত্রণায় ছটফট করছিল হ্যারিয়েট এবং সামান্য লাল হয়ে গেছে ব্যান্ডেজটা। আমার ঘরে এসে হাজির মার্গারেট, মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। কাঁদতে আরম্ভ করে দিলো। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম আমি, সে কোথায় গেল, যার সাইকেল?

স্নান হাসলেন ভদ্রলোক। আমি সেই লোক ভদ্রলোক বললেন, দোষ ওনার ছিল না দোষ আমারই, রাস্তার একপাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন উনি এবং পেছন থেকে আমি ওকে ধাক্কা মারি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কাছেই একটা ডাক্তারখানা ছিল এটাই আমার ভাগ্য ভাল।

চুপচাপ রইলাম কারণ আমার আর কিছুই বলার ছিলনা। নিজের ঠিকানা কিছুক্ষণ পর আমাকে দিলেন ভদ্রলোক এবং বললেন, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন প্রয়োজন হলে, অবশ্য আবার আমি আসবো।

ভদ্রলোক চলে গেলেন এবং আমি হ্যারিয়েটের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম ওর কাছে বসে। মার্গারেট বসে রইলো পায়ের কাছে চুপচাপ। হ্যারিয়েট একসময় ঘুমিয়ে পড়লো যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে। আমাদের বাধ্য হয়ে সেদিন হোটেলেই খেতে হল।

হোটেলে খেয়ে ঘরে ফিরে এলাম আমি আর মার্গারেট। আমি হারিয়েটের ঘরে থাকলাম সেদিন সারা বিকালটাই। বারবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি ওর। ঘুমিয়ে পড়ল ও একসময়। একটু স্বস্তির ভাব লক্ষ্য করলাম আমার মধ্যে কারণ আমার তেমন একটা দুঃখ হচ্ছিল না। আমার। মনে খুব একটা দাগ কাটেনি হ্যারিয়েটের দুর্ঘটনা এবং তার ফলে নিজেই আশ্চর্য হলাম। রাত দশটায় চুপিচুপি গিয়ে হাজির হলাম মার্গারেটের ঘরে। দরজা ভেজানো ছিল এবং বিষয় মুখে বিছানায় শুয়েছিল মার্গারেট। আমাকে দেখেও ওঠার কোনোরকম লক্ষণ দেখলাম না ওর। আমি হাত রাখলাম ওর মাথায়। বললাম, তোমার ভয়ের কিছু নেই, কারণ তোমার মা শিগগির সেরে যাবে।

ওর মন খুব ভেঙে পড়েছে, ও যেমন ছিল তেমনই রইল। আমি হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম ওর মাথায়। আমার মধ্যে ভেতরে একটা চাপা ভালগা কাজ করে যাচ্ছে, যদিও বাইরে উদ্বেগ প্রকাশ করছি। আমি আমার পরমপ্রিয়া মার্গারেটকে একবার কাছে পেতে চাইহ্যারিয়েটের অসুস্থতার সুযোগে। তোমার মায়ের পায়ে সামান্য লেগেছে, তো তার

জন্য অত ভেঙে পড়ছে কেন মিমি, তেমন কিছু হয়নি, দেখবে উনি সেরে উঠবেন সপ্তাহখানেকের মধ্যেই।

মার্গারেট এতক্ষণ পাশ ফিরলেও এবার চিৎ হলো। আমি বসে আছি ওর পাশের বিছানায়। ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে হ্যারিয়েটকে তাই ওর ঘুম ভাঙার কোনো সুযোগ নেই। ও আমার দিকে তাকিয়ে, জিজ্ঞেস করলো এখনও কি ঘুমোচ্ছ মা।

ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে ওকে, তাই ওর ঘুম ভাঙবে না কাল সকালের আগে–আমি তাকালাম ওর দুচোখের দিকে। ওর অপূর্ব দেহটা দেখা যাচ্ছিল পাতলা ফ্রকের নীচে।

হাজার হাজার পোকা যেন নেচে বেড়াচ্ছে আমার মাথার মধ্যে। ওর গালে হাত বুলোতে লাগলাম আমি। ওকে পাগলের মত চুমু খেতে আরম্ভ করলাম ওর ওপর শুয়ে পড়ে। ছটফট করতে লাগল মার্গারেটের শরীরটা। আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেছে ও। ঘরের দরজাটা খিল দিয়ে এলাম আমি একবার উঠে গিয়ে। জ্বালিয়ে দিলাম নীল আলোটা। দুচোখে মার্গারেটের তখন ঘোর আসছে। আবার আমি এসে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে ও আমার পিঠটা খামচে ধরছিল আমার অসহ্য চুমুতে অস্থির হয়ে গিয়ে। আমার কাছে এই মুহূর্তে ও একজন পরিপূর্ণ নারী। ও আমার স্বপ্নের নায়িকা। আমি হাজার হাজার মাইল হাঁটতে রাজি এই মার্গারেটের জন্যেই। খুলে দিয়েছি ওর ফ্রকটা। কোনো পোশাক ছিলনা আমার শরীরেও হাত রাখলাম আমি ওর উরুসন্ধিতে। ও আমাকে জড়িয়ে ধরে ছটফট করছিল একটা অসহ্য সুখের অনুভূতিতে। ওর মুখ থেকে বেরোচ্ছিল একটা অস্ফুট শব্দ। আমি মিলিত হলাম এই প্রথম মার্গারেটের সঙ্গে। আমরা ভেসে বেড়াতে লাগলাম একটি তীব্র স্বর্গীয় সুখে। আমাদের

কাছে এখন কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আমি আর আমার স্বপ্ন নায়িকা মার্গারেট এখন একা এই পৃথিবীতে। পরস্পরকে আমরা নিঃশেষ করে দিলাম তীব্র আনন্দের শিখরে ওঠার চরম মুহূর্তে।

ওর পাশে ক্লান্ত শরীরে শুয়ে রইলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক। হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম ওর চুলে আমি। আমাদের বয়সের যে একটা বিরাট ফারাক আছে তা আমার মনে হচ্ছিল না। আমাকে বিয়ে করতে চায় ওর মা স্বয়ং হ্যারিয়েট। মার্গারেট এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো ক্লান্ত শরীরে। ওকে একটা চুমু খেলাম আমি এবং তারপর ফ্রকটা ওর ওপর চাপা দিয়ে দিলাম। তারপর পোশাক পরে নিজের ঘরে চলে এলাম। রাত তখন বারোটা। হ্যারিয়েটের ঘরে উঁকি মারলাম আসবার পথে সিঁড়ি দিয়ে নামতে। ও ঘুমোচ্ছে অকাতরে। আমার ঘরে চলে এলাম আমি পা টিপে টিপে। বিছানাতে শুয়ে পড়লাম। আমি আজ নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছিমার্গারেটের দেহের প্রতিটি সম্পদ। একটা কুকুর যেন চীৎকার করে উঠলো কোথা থেকে। এ বাড়ির কুকুরটা ঘুমোচ্ছ। একটা বেড়ালের কান্না ভেসে এল দূর থেকে। আমার ভেতরে ন্যায় অন্যায় কোনো কিছুরই বোধ নেই এই মুহূর্তে। মার্গারেটকে ছাড়া আমি থাকতে পারবোনা আমি শুধু একথাই ভাবছিলাম। হ্যারিয়েট আমার সামনে একটি বাধা। হ্যারিয়েটের কাছে ধরা পড়ে যেতে হবে একদিন এরকম ভাবে চললে। কি হবে তখন। খেয়াল নেই একথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি। আমার পরের দিন সকালে নটা নাগাদ ঘুম ভাঙলো।

.

০৮.

মাসখানেক কেটে গেছে এরপর। সবটাই প্রায় সেরে গেছে হারিয়েটের পা। এখন সামান্য একটু খুড়িয়ে হাঁটে। ওটাও কমে যাবে কিছুদিনের মধ্যে বলে মনে হচ্ছে। একটা অন্য উপসর্গ দেখা দিয়েছে ওর মধ্যে যে ও মাঝেমাঝেই ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ভালভাবে কিছু গুছিয়ে বলতে পারে না তখন। ভীষণ অমনোযোগী হয়ে পড়ে এমনকি কথাবার্তা শোনার পরেও। দিন কয়েকের মধ্যে ব্যাপারটা সেরে ওঠে অবশ্য। এটা বেশি দিন থাকে না। হ্যারিয়েট স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে এবং পড়াশুনায় মন দিয়েছে মার্গারেটও। পাশ করতেই হবে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় এবং ও আরো সুন্দরী হয়েছে আমার চোখে।

আমার প্রিয়ার সঙ্গে আর একদিন মাত্র আমি চরমভাবে মিলিত হতে পেরেছিলাম। তেমন একটিও সুযোগ পাইনি অবশ্য হ্যারিয়েট সুস্থ হবার পর। হ্যারিয়েট একদিন দুপুরে আমাকে যৌন মিলনের প্রস্তাব দিল আহত অবস্থা থেকে সেরে ওঠার ঠিক কুড়িদিনের মাথায়। ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না আমি অবশ্য ব্যাপারটার জন্য। হ্যারিয়েটকে দুঃখ দিতে চাইনি তাই অগত্যাই আমি মিলিত হলাম ওর সঙ্গে। ব্যাপারটা যান্ত্রিকভাবেই শেষ হল এবং এর ফলে আমি কোনো সুখ পেলাম না। গম্ভীর হয়ে গেছে হ্যারিয়েট এবং ওর যৌন ক্ষিদে আরো যেন বেড়ে গেছে। আমার নিম্নাঙ্গে ও খেলা করে একটা যেন তীব্র সুখ পায়। তাই মাঝে মাঝে ওর হাত সেখানে চলে যায়।

আমি বেশ মানিয়ে নিয়েছি এই বোম্বের জীবনটা। বেশ সাজানো গোছানো এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ এই শহরটি। আমি ভারতবর্ষের লোকেদের অতিথিবৎসল গুণ দেখে খুবই খুশী। নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলাম হ্যারিয়েটের এক বান্ধবী মারাঠী পরিবারে। পরিবারে রয়েছে জনাতিনেক ছেলে মেয়ে এবং স্বামী স্ত্রী। আমার মনেই হচ্ছিল না যে আমি

বিদেশী ওরা আমার সঙ্গে এতই প্রাণ খুলে গল্প করছিল। আমার খুব ভাল লেগেছিল ব্যাপারটা। আমি মাঝে মাঝেই দেখাশুনা করতে যাই আমার নিজের হোটেলটা। আমি চেম্বার করিনি এখানে। ব্যাপারটা নিয়ে এগোতে আমার সম্ভব হচ্ছিল না। আমার কর্মচারী ভালই চালাচ্ছে আমার হোটেলটা। সে তার স্ত্রী এবং পুত্র নিয়ে হোটলের একটি ঘরেই কাটায়। এছাড়া জনা তিনেক রাঁধুনি এবং চাকরও থাকে হোটেলের আরেকটা ঘরে। আমি ব্যাপারটা অপছন্দ করি.তাই আমার থাকার কোনো প্রশ্নই উঠে না। হোটেলটা বড় করার আমার কোনো ইচ্ছা নেই এই মুহূর্তে। আমি এই হোটেলের ঠিকানাতেই পাই লন্ডনের হোটলের টাকা পয়সা। আমার নির্দেশ সেরকম ভাবেই ওদেরকে দেওয়া আছে। তখন সকাল নটা, একটা চেয়ারেই বসেছিলাম আমি আমার ঘরে এবং চারদিকে তখন রোদ ঝলমল করছে।

একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে এই বোম্বে শহরটার। হ্যারিয়েট এবং আমি চেয়ারে বসেছিলাম মুখোমুখি এবং একসঙ্গে চুমুক দিচ্ছিলাম কফিতে।

হ্যারিয়েট আমাকে হঠাৎ বলে উঠল। তুমি ঠিক করলে চেম্বারটা কবে করবে?

আমি এখনো এ বিষয়ে কিছু ভাবিনি। আমি বললাম নিস্পৃহ ভাবেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো হ্যারিয়েট।

কেমন যেন হচ্ছে মিমি দিনকে দিন, ভালো করে কথা বলে না আমার সঙ্গে। আমি নাকি ওর ভাল চাইতে পারি না কারণ আমি ওর পিসি, মা নই, একদিন আমাকে বলেই বসল।

আমি কি বলব ভেবে না পেয়ে মৃদু হাসলাম, বললাম, ও এমনিতেই একটু ছটফটে বাচ্চা মেয়ে। কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।

হ্যারিয়েট বললো, আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে আমি ওকে পাঠিয়ে দেব ভাবছি ওর পরীক্ষা হয়ে গেলেই, অন্তত মাস তিনেকের জন্য।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আত্মীয়া, কি সম্পর্কের?

আমার মায়ের খুড়তুতো বোন, আমার এক দূরসম্পর্কীয়া মাসি। সে এখন থাকে কলকাতায়। হ্যারিয়েটের এই কথা শুনে আমি মনে মনে উতলা হয়ে উঠলাম।

আমার পক্ষে অসম্ভব এতদিন আমার স্বপ্নের নায়িকাকে ছেড়ে কাটানো। আমি হাঁপিয়ে উঠি ওকে না দেখতে পেলেই। আমিবললাম, কি দরকার তার, আমি একটু বুঝিয়ে বললেই ও এমনিতেই জল হয়ে যাবে। আমি ওকে কোথাও নিয়ে যাব বরং তার চেয়ে। আমি কিছুদিনের জন্য বেরিয়ে আসব কিন্তু তুমি যাবে কি করে?

যাবার কোনো উপায় হ্যরিয়েটের নেই। সে বোম্বের শহরতলীতে চাকরী পেয়েছেসদ্য একটি স্কুল মাস্টারীর, চাকরীস্থল বোম্বের শহরতলীতে এবং সেটি ঘণ্টাখানেকের রাস্তা এখান থেকে। কাজে যোগ দেবে ও দিন সাতেক পর থেকেই। আমার যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, হ্যারিয়েট বলে উঠল।

আমাদের বিয়েটা এবার সেরে ফেলি এস, হঠাৎ ও একথা বলল সামান্য থেমে।

আমি ঘাবড়ে গেলাম প্রথমে প্রশ্নটা আচমকা হওয়াতে। হ্যারিয়েট কি ধরতে পেরেছে আমার আর মার্গারেটের সম্পর্কটা, আমি একথা মনে মনে ভাবলাম তাই বলে উঠলাম, আমার চেম্বারটা খুলে আগে পোর না জমালে কি হবে।

কিছু বললো না হ্যারিয়েট। ও শুধু গম্ভীর হয়ে গেল। আমি বাইরে তাকিয়েছিলাম জানলা দিয়ে। একটা ফুলের গাছ ছিল সামনে। ফুল হয়নি এতে শুধু কুঁড়ি হয়েছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসা গাড়ির শব্দ। হ্যারিয়েট কখন যে আমার সামনে থেকে উঠে গেছে সেটা আমার খেয়ালই নেই।

একটা ঘটনা ঘটল ঠিক এক সপ্তাহ খানেক পরেই। হ্যারিয়েট নিজেই সেদিন আমার ঘরটা পরিষ্কার করেছে দুপুরের দিকে নিজে হাতে। আমার সামনে এসে দাঁড়ালো সে মার্গারেট স্কুলে চলে যাবার খানিকক্ষণ পর। ওর হাতে একটি বই এবং তখন ওর চোখ জ্বলছে রাগে। ও সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ছিঃ ছিঃ এত নীচ, তুমি, আমি তোমাকে অবশ্য অনেক আগেই সন্দেহ করেছিলাম শেষ পর্যন্ত তুমি কিনা নজর দিয়ে বসলে ঐ বাচ্চা মেয়েটার উপর।

ওর একটা হাত আমি ধরতে গেলে ও আমাকে ছিটকে সরিয়ে দিল। আমাকে ছোঁয়ার অধিকার তুমি হারিয়েছ, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না, ও সামনে দাঁড়িয়েই বলল এ কথা।

অবাক আমি। হ্যারিয়েটের তো জানার কথা নয় আমাদের সম্পর্কের কথা। আমি তখন শান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বলতে কি ব্যাপারটা?

কিছুনা বলে হ্যারিয়েট বইয়ের ভেতর থেকে একটি খাম আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, দেখ, তোমার কীর্তির নমুনা দেখ।

এবার আমি ব্যাপারটা বুঝলাম। সমুদ্রের ধারে আমার ক্যামেরায় আমি মার্গারেটের বেশ কয়েকটি ছবি তুলেছিলাম এবং ও সেগুলি পেয়েছে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে। বেশ কয়েকটা ছবি তুলেছি আমি সমুদ্রে মান করা অবস্থায় এবং এর মধ্যে রয়েছে ব্রা এবং প্যান্টি পরা কিছু ছবি। হ্যারিয়েট ক্ষেপে আগুন হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে এই ছবিগুলি দেখে, সত্যি বিপদ আমার শিরে। একথা ভেবে আমি ঢোক গিললাম। ওর হাতে না পড়লেই ভাল হত ছবিগুলি, কিছু করার নেই তাতে। এতেই তুমি রেগে যাচ্ছ, এই সামান্য ব্যাপারে।

হ্যারিয়েট কঠিন স্বরে বলল, এতে আমার রেগে যাওয়াটা কি স্বাভাবিক নয়?

আমি এরপর শান্ত স্বরে বললাম, তোমাকে বলতে আমি ভুলে গেছি যে, একজন মোটামুটি বিখ্যাত চিত্র পরিচালক শুটিং করতে আসছে এখানে। আমি ভাবছি তার কাছে এই ছবিগুলি পাঠাব কারণ আমার বন্ধু যদি একটা রোল দেয় মার্গারেটকে।

হ্যারিয়েট কিছুটা নরম হয়ে বলল, কিন্তু ও কথা তুমি তো আগে বলনি আমাকে।

আমি বললাম, ক্ষমা করো আমাকে, অন্য কিছু ভেবনা তুমি প্লীজ, আসলে ব্যাপারটা তোমাকে বলতে আমি একেবারেই ভুলে গেছি। চল ঘরে চল।

ওর ঘরে নিয়ে গেলাম হ্যারিয়েটকে ওর কাধ ধরেই। ওকে এরপর বিছানায় শুইয়ে দিলাম এবং তারপর বললাম, হ্যারিয়েট আমি তোমাকেই ভালবাসি।

চোখে জল এসে গেছে হারিয়েটের। তাই ওকে একটা চুমু খেলাম আলতো করে এবং বলে উঠলাম, মিমি তোমার মত আমারও মেয়ে; তোমারই মত আমি ভাল চাই ওর। আবার বললাম একটু থেমে, ও একজন নামী ফিল্ম স্টার হবে, ও আমাদের গর্ব, ওর নাম হবে, টাকা হবে, সেটা কি তুমি চাও না।

হ্যারিয়েট আমার মাথায়, গালে, ঠোঁটে এবং কপালে সব জায়গাতেই চুমু খেতে লাগল এবং আমি তখন বুঝলাম যে আমার অভিনয়কে আমি সার্থক করতে পেরেছি হ্যারিয়েটকে শান্ত করে। কতদিন চালিয়ে যেতে হবে এই মিথ্যা অভিনয় কারণ আমি হ্যারিয়েটকে একবিন্দু ভালবাসি না। মার্গারেটই আমার ধ্যানজ্ঞান। ও ছাড়া আমি কারো কথা চিন্তা করতে পারি না কারণ ও আমার জীবনের ধ্রুবতারা, ওকে ছাড়া আমি এক সেকেন্ডও থাকতে পারবো না। এই মুহূর্তে হ্যারিয়েটকে চটানো আমার পক্ষে অসম্ভব কারণ মার্গারেটকে পাবার জন্যই আমাকে অভিনয় চালিয়ে যেতে হচ্ছে। হ্যারিয়েটকে চটালে মার্গারেটকে আমি চিরকালের মত হারাব এবং আমার চোখের সামনে থেকে বরাবরের মত অদৃশ্য হয়ে যাবে আমার প্রেমিকা। আমি চিন্তাতেই আনতে পারছি না ব্যাপারটা। আমাকে জড়িয়ে ধরছিল হ্যারিয়েট। আমি ওর একমাত্র অবলম্বন বলে মনে হচ্ছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, আজ রাতে আমি তোমার ঘরে আসব পিটার?

কেঁপে উঠলাম আমি, কারণ আমার চোখের সামনে তখন একমাত্র মার্গারেটের মুখটাই ভাসছে। আমার হারিয়েটের সঙ্গে মিলিত হবার সময়ও মনে হয় আমি মার্গারেটের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। মৃদু হেসে বললাম, ঠিক আছে, এসো।

আমি যদি মিমিকে নিয়ে দিল্লী যাই, তোমার তাতে কি আপত্তি আছে হ্যারিয়েট। আবার একটু থেমে আমি বললাম।

হ্যারিয়েট বলে উঠল, কেন?

ওর প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, ও যে আমার বন্ধু যে ছবিটা করবে তা হবে প্রধানতঃ ভারতবর্ষের পটভূমিকায়। প্রেমের ছবি তাই আগ্রার তাজমহলে শুটিং হবে। মার্গারেটকে নিয়ে একবার ওর কাছে যাব বলে ভাবছিলাম। মিমি তো রীতিমতো সুন্দরী তাই ওকে নিশ্চয় একটা রোল দেবে।

হ্যারিয়েট কপট রাগে বলল, তুমি তো আমায় বলছো না, আমি বুঝি সুন্দরী নই।

আমি বললাম, তুমিও সুন্দরী কিন্তু যেহেতু ওরাকমবয়েসী ভারতীয় মেয়ে চাইছেতাই মিমিই উপযুক্ত হবে কারণ মিমিকে ভারতীয়ই বলা যায়।

হ্যারিয়েট জবাব দিল, বুঝলাম। বেশ কিছুক্ষণ কাটলো আমার একটা হাত ওর একটা হাতের উপর রেখে। হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি মার্গারেট স্থির দৃষ্টিতে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কে জানে কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ডাকলাম, মিমি।

ততক্ষণে হ্যারিয়েট দরজার দিকে তাকাতেই ওরমার্গারেটের সঙ্গে চোখাচোখি হল। হ্যারিয়েট ঠিক সেই মুহূর্তেই ওকে বিষণ্ণ স্বরে বলল, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন মিমি, ভেতরে আয়।

ভেতরে ঢুকে মার্গারেট সোজা একভাবে দাঁড়িয়ে হারিয়েটকে বলল, আমার খিদে পেয়েছে সেটা কি তুমি ভুলে গেছ, অথচ এখানে রয়েছ।

আমার কিছুই বলার নেই বলে আমি নিস্পলক দর্শক হয়ে রইলাম। মেয়েদের পারস্পরিক লড়াইয়ে নীরব দর্শক হওয়া ছাড়া প্রকাশ্যে যাবার কোনো উপায় নেই। বেরিয়ে গেল ওরা দুজন এবং যাবার সময় এমনভাবে আমার দিকে মার্গারেট তাকালো যার অর্থ হতে পারে অনেক রকম।

.

০৯.

মার্গারেটের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, তাই সে এখন রয়েছে শুধুই ফলের অপেক্ষায়। যদিও এ ব্যাপারে তার খুব একটা চিন্তা নেই। মাঝখানে আরো একবার হ্যারিয়েট মানসিক রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মনমরা হয়ে থাকতো সবসময়। কান্নাকাটি করত এবং মার্গারেটকে একেবারেই সহ্য করতে পারতো না। স্থানীয় একজন বিখ্যাত মানসিক রোগের চিকিৎসককে দেখালাম বেশ কিছুদিন ধরে। মোটামুটি ভাবে সেরে উঠে এখন রান্নাবান্না এবং কাজে যাওয়া ঠিকঠাকই করছে। পুরোপুরি কাটেনি ওর এই বিষাদ রোগটা। রোগটা অবশ্য খুব জটিল বলে ডাক্তার বলেছে। আবার দেখা দিতে পারে যে

কোনো সময় এবং আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠাটা অস্বাভাবিক নয়। ওর মানসিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বারবার। মনের মধ্যে এক বিচিত্র সন্দেহ এবংঅবিরাম দ্বন্দ্বের ফলই এই রোগের মূল কারণ বলে ডাক্তারের কাছে জেনেছি। ওর মানসিক বিশ্বাসটা একান্ত জরুরী যদি ও সুস্থ হয়ে উঠতে চায়। আমি অবশ্য দৈহিক রোগের চিকিৎসক, আমার কারবার অবশ্য মন নিয়ে নয়। আমি এই সব বিষয়ে একরকম অসহায় এবং আমার অনেকটা সময় কেটে যায় হারিয়েটের পেছনে। মাঝবয়সী মহিলা একজন রাঁধুনী রাখা হয়েছে। কারণ হ্যারিয়টের এখন বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। কিছুদিন বোষের নানা জায়গাতে বেড়িয়ে এলাম ওদের নিয়ে। ব্যাপারটা যেন কিছুতেই না বুঝতে পারে হ্যারিয়েট, এটাই আমার এখন একমাত্র লক্ষ্য বিশেষ করে। মার্গারেটকে তাহলে আমি হারিয়ে ফেলব চিরকালের মত। এখন মাঝে মাঝেই হ্যারিয়েট জোর দিয়ে ওঠে দুটো কথার উপর। এক, যতদূর সম্ভব বিয়ে করতে হবে তাকে এবং দুই মার্গারেট ভালভাবে পড়াশুনা করবে ওকে একটা বোর্ডিং এ পাঠিয়ে দিলে। এবং সেখানেই ও থাকবে। হ্যারিয়েট এসব কথা কেন বলছে তা আমি বুঝতে পারছিলাম পরিষ্কার। এ দুটো প্রচেষ্টাকেই বাধা দেওয়া এখন আমার একমাত্র কাজ।

মার্গারেটকে ওর কাছ থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে, এবার আমি সেই পরিকল্পনাটাই করলাম কিছুটা পরিবর্তন অবশ্য লক্ষ্যকরছিআমি মার্গারেটের ব্যবহারেও। একবারের জন্য এলেও সে বেশিক্ষণ আমার ঘরে থাকতে চায় না। সন্ধ্যাবেলায় মনের ভেতর রীতিমতো অস্থিরতা নিয়ে আমি ঘরে বসে আছি। এখানে এসেছিলাম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু এখন চলেছিনিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে। মানুষের ভাগ্য আর যোগাযোগ সবকিছুই নিয়ন্ত্রণে বাধা, তাই একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই। আমার নিজেকে এই মুহূর্তে ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক বলে মনে হচ্ছে। হ্যারিয়েটকে আপাতত

শান্ত করার জন্য ওর দুটো প্রস্তাবই মেনে নিয়েছি। মাস তিনেক অপেক্ষা করতে বলেছি বিয়ের জন্য এবং আরো বলেছি তার মধ্যে মার্গারেটকে বোর্ডিং–এ পাঠিয়ে দিয়ে তবে বিয়েটা করব। যদিও জানি এ দুটোই অবাস্তব। বোর্ডিং–এ যাবে না মার্গারেট এবং বিয়েও করবো না হ্যারিয়েটকে। আমি এখান থেকে বরঞ্চ ওকে নিয়ে অন্য কোথাও সরে যাব। কাউবে টের পেতে দিইনি আমি এ সমস্ত ঘুণাক্ষরেও। চেয়ারে বসেছিলাম চুপচাপ, চোখ দুটি বুজে। টের পাইনি, মার্গারেট কখন এসে দাঁড়িয়েছিল চুপিচুপি। মার্গারেট খিল খিল করে হাসছে, আমি আমার কপালে একটা চুমু পড়তে দেখেই বুঝলাম। আমি পাগল হয়ে যাই ও এরকম ভাবে হাসলে এব তখন আমার আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকেনা নিজের ওপরে। আমি ওর হাত ধরতে যেতে ও খানিকট দূরে সরে গেল। চোখ বুজে ভাবছিলে কি, ও তারপর ওখান থেকেই বলল।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি এখন যার কথা ভাবছি সে হচ্ছে তুমি।

মার্গারেট রেগে উঠল কপট রাগে এবং বলল, কথাটা মোটেই ঠিক নয়, তুমি মিথ্যুক, তুমি নিশ্চয় ভাবছিলে অন্য কারোর কথা।

ওর ইঙ্গিত বুঝতে আমার কিছুই অসুবিধে হল না যদিও পরিষ্কার করে কিছু বলল না।

মার্গারেট বিশ্বাস কর, আমি তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম, আমি আবার বলে উঠলাম

বিছানার উপর আমার কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে মার্গারেট উঠে বসল। ঠিক দরজার সামনে বসল যাতে আমি ধরতে গেলে পালাতে পারে।

মার্গারেট আবার জিজ্ঞেস করল, দিল্লী নিয়ে যাবে বলে যে তুমি আমায় বলেছিলে কি হল তার?

একটু অপেক্ষা কর, আগে তোমার মায়ের অনুমতিটা নিই, তারপর নিশ্চয়ই যাব, আমি বললাম।

দুচোখে রহস্যের ঝিলিক নিয়ে সে নিজের চুল টানতে থাকল এবং বলতে লাগল, কিন্তু মার কাছে যদি অনুমতি না পাই।

চিন্তা করো না, মা নিশ্চয় অনুমতি দেবে, খিলখিল করে হেসে উঠল ও, ওর হাসি আমাকে পাগল করে দেয় এবং আমি তা সহ্য করতে পারি না। স্কার্টের নিচের দিকটা কিছুটা উঠে গেছে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি ওর ফর্সা উরু দুটো এবং সেটিই আমার শরীর গরম করে দিচ্ছে যেকোনো মুহূর্তে হারিয়ে এসে পড়তে পারে, তাই কিছুই করার ছিল না। মার্গারেট হাসি থামিয়ে আবার বলল, আমাকে নিয়ে যাবে কোথায় দিল্লীতে? ।

জবাব দিলাম, কনট প্লেস নামক একটি হোটেলে আমরা উঠব এবং সেখান থেকে যাব আগ্রা। আমাদের শুটিং হবে তাজমহলের সামনে।

মার্গারেট জিজ্ঞেস করল, কোন ভূমিকায় আমি অভিনয় করব?

তুমি অভিনয় করবে একজন ভারতীয় কিশোরীর ভূমিকায়।

আমি জানি এসব কথাই বানানো, যদিও বলেছিলাম এসব কিন্তু জানতাম যেবাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব নেই। ওকে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি এটা। আবার বললাম, এটি দারুণ কাহিনী, এই মেয়ে প্রেমে পড়বে মাঝবয়সী ছেলে এবং তার বাবা। বাবা আত্মহত্যা করবে শেষ পর্যন্ত এবং পুলিশ সেই চিঠির সূত্র ধরে দুজনকেই গ্রেপ্তার করবে। পূর্বপুরুষের ব্যাভিচারের ফলে তখন কাল রোগে পেয়েছে মেয়েটাকে, মেয়েটা নিজেই সমুদ্রের কাছে সঁপে দেবে শেষ পর্যন্ত নিজেকে কাহিনী এটাই।

ছেলেটার কি রোগ হয়েছিল, মার্গারেট শুনে তারপর জিজ্ঞাসা করল।

আমি বললাম সিফিলিস।

রোগটা কি খুব খারাপ রোগ? মার্গারেট জিজ্ঞাসা করল আবার।

মার্গারেট আবার জিজ্ঞাসা করল, ব্যাভিচার কথাটার অর্থ কি?

ও কি জানে না সত্যিই, না এর পেছনে কিছু উদ্দেশ্য আছে, এই কথার কি জবাব দেব তার আমি ভেবে পেলাম না।

ব্যাভিচারী তাকেই বলে যে পুরুষ অনেক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করে, আমি কিছুক্ষণ ভেবে বললাম।

ও আবার হেসে বলল, তুমি যেমন।

সামান্য বালিকার মত ওকে মনে না হয়ে এই মুহূর্তে ওকে আমার একজন পরিপূর্ণ নারী বলে মনে হচ্ছিল। সব ছলাকলার বিদ্যেই জানা নারীদের। যে কোন পুরুষের পক্ষেই নারী যে রহস্যময়ী তা জানা অসম্ভব। তোমার কেন আমাকে ব্যাভিচারী মনে হল, জিজ্ঞেস করলাম।

খিল খিল করে নিষ্পপের মত পবিত্র হাসি হেসে উঠল মার্গারেট। সে বলল, তোমার ডায়েরীটা পড়ে আমি দুজনের নাম প্রথমে দেখেছি এবং এখন আরো।

মার্গারেট থেমে গিয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল। থেমে গেলে কেন, আমি বলে উঠলাম, কি ব্যাপার।

চুপ করে গেল আবার মার্গারেট। আমি তখন আবার বলে উঠলাম, বলল।

নিশ্চুপ হয়ে রইল সে। অন্যের ডায়েরী তোমার না বলে পড়া উচিত হয়নি মিমি, আমি ধমকের সুরে বললাম।

মার্গারেট আদুরে ভঙ্গীতে কপট রাগে ঠোঁটটা ফুলিয়ে বলে উঠল, তুমি সবসময় উচিত অনুচিত মেনে চল, আমি যা করেছি তা বেশ করেছি। আমি ওকে এরপর মৃদু হেসে ধরতে গেলাম এবং সেই মুহূর্তে ভয় পেয়ে গেল সে এবং হরিণীর মত বিছানা থেকে নেমে একেবারে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে পালিয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ঠিক দরজার সামনে। আমার চোখের সামনে থেকে ঠিক যে মুহূর্তে চলে গেল মার্গারেট, হ্যারিয়েট পরক্ষণেই সিঁড়ি বেয়ে বিরক্ত মুখে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, খুব বিরক্ত করছিল বুঝি মিমি তোমাকে।

আমি হেসে বললাম, না ওর ছটফট করাটা একটা অভ্যাস, কিন্তু ও আমাকে কোনোরকম বিরক্ত করেনি।

আমি আর পারছি না ওকে নিয়ে, ও বড্ড অসহ্য করছে। ও আর একদম আমার কথা শুনছে না।

হ্যারিয়েটকে বোঝালাম, সব ঠিক হয়ে যাবে, ওর মন খুব সাদাসিধে যদিও ও একটু ছটফটে এবং এর জন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই।

হ্যারিয়েটকে ঘরে নিয়ে এসে মুখোমুখি চেয়ারে বসলাম দুজনে। আমি আসল কথাটা পাড়লাম এটা ওটা খানিকক্ষণ বলার পরে। বললাম, আমার সেই বন্ধু এখন দিল্লীতে এসেছে এবং আমি ভাবছি ওর ওখানে নিয়ে যাব মিমিকে।

হ্যারিয়েট জিজ্ঞেস করলো, সে দিল্লীতে কোথায় এসেছে। জবাবে বললাম, কনট প্লেসের একটা বড় হোটেল।

একটু হাসলাম, তারপর বললাম, মিমিকে অবশ্য নিতে পারে এবং যেহেতু আমার চেনা শোনা আছে তাই আমি বলতে পারি কথাটা। এই বলে হ্যারিয়েটের চোখের দিকে তাকালাম এবং তারপর আবার বললাম, তুমিও যেতে পার, অবশ্য যদি তুমি যেতে চাও।

অনকেক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হ্যারিয়েট এরপর ওলটাতে লাগল একটি ম্যাগাজিনের পাতা। তারপর বলে উঠল, স্কুলের পরীক্ষা আছে তাই কামাই করা যাবে না বলে আমার

পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরাই বরঞ্চ ঘুরে এস ওখানে। হ্যারিয়েট বলে উঠল সামান্য থেমে। মিমি তো দিল্লী দেখেনি তাই বেড়ানোও হবে এবং তার সঙ্গে কাজও হবে।

তুমি কিছু মনে করো না, আমি ওর হাতে হাত রেখে বললাম।

মনে আবার কি করবো।

অনুমতি দিচ্ছ তো তাহলে যেতে?

হ্যারিয়েট মৃদু হেসে প্রশ্নের জবাবে বলল, বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে কিন্তু ফিরে এসেই, সুতরাং কথা দিয়ে যাও যেন দেরী না হয়।

গরম একটা রক্তের স্রোত বয়ে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। একটা চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে চলেছি আমি। ঠিক কোন জায়গাতে পৌঁছাব আমি তা বলতে পারে একমাত্র ভবিষ্যই। আমি শুধু বললাম, আগে আমাকে ফিরে আসতে দাও।

হ্যারিয়েট জিজ্ঞেস করল, কত দিন লাগবে?

হ্যারিয়েটের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে তাই আনন্দের আর সীমা রইলো না আমার। যাওয়ার অপেক্ষা শুধু এখন। ছটফট করতে করতে বলে উঠল হ্যারিয়েট, এখন যেও না, যত ইচ্ছে বিয়ের পর যেও, তখন আর আমি কোনো বাধা দেব না।

তুমি সত্যিই খুব ভাল হ্যারিয়েট, আমি বলে উঠলাম।

আমার চোখে ভাসছে তখন দুটি মহল, এক দিল্লী এবং দুই হচ্ছে আগ্রার তাজমহল। শেষ গন্তব্যস্থল কলকাতা, যেখানে আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। এটি একটি তাজমহল, যা আমি ছবিতে দেখেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি। আমার ঘরে এসেছিল কিন্তু হ্যারিয়েট সেই রাতে। ওর সব কিছু ভরিয়ে দিলাম আদরে আদরে। আগে কখনও এমন নিখুঁত অভিনয় করিনি এবং পরে কখনও করব বলেও জানি না।

একটা গোপন ভয়

১০.

আজ সকালটা আমার কি যে ভাল লাগছিল বলার নয়। বারবারই অবশ্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল মনের মধ্যে একটা গোপন ভয়। আমি বিনা দ্বিধায় এখন মার্গারেটকে নিয়ে যেতে পারি কারণ কোনো আপত্তি নেই হ্যারিয়েটের। চারদিক রোদ ঝলমল করছে এবং একটি বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট উঠেছে বোম্বের এই এলাকায়। মার্গারেটকে নিয়ে একটু বাইরে বেরোবার প্রয়োজন আছে। আমি সোজা হ্যারিয়েটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এবং তখন ও মৃদু হাসলো। ওর শরীর ঢাকা একটি সবুজ রঙ-এর গাউনে। কি ভাবছিলে, ও বলে উঠল।

ছ্যাৎ করে উঠলো আমার ভেতরটা। আমি কোনো রকম অস্বাভাবিক ব্যবহার করে ফেলছি না তো আমার ভেতরকার পরিকল্পনা গোপন রাখতে গিয়ে। সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে যদি জানতে পারে। তোমার কথা ভাবছিলাম, আমি মৃদু হেসে বললাম।

সেটা আমার সৌভাগ্য বলতে হবে, এই বলে ও চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে হেসে উঠলো। চুমুক দিলাম আমি চায়ের কাপে। সবুজের সমারোহ সারা বাগান জুড়ে এবং আমি তাকিয়ে ছিলাম সেইদিকে। মাঝে মাঝেই একটা মুখ দোতলার জানলার দিকে দেখা যাচ্ছিল এবং আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে দোতলার জানলা দিয়ে উঁকি মারছে মার্গারেট। ইদানিং আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না মার্গারেটের আচার আচরণ। কোনো কোনো সময় কথার খৈ ফোটে মুখে এবং ভীষণ ছটফটে, উজ্জ্বল এবং

ভোলামেলা হয়ে পড়ে, কোনো সময় আবার কথা বলতে চায় না একেবারেই। যদি কোনো কথা পাঁচবার বলি তারপর একবার উত্তর দেয়। আমি কোনো সময়েই আজকাল আর ওকে ঠিকমত বুঝতে পারিনা। তাই ও যেন ক্রমশঃ রহস্যময়ী হয়ে উঠছে আমার কাছে। আমার পক্ষে কিছুতেই অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে এসব স্বত্ত্বেও ওর প্রতি আকর্ষণ আমার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। উন্মাদ আমি মার্গারেটের জন্য। এক সুতোয় গাথা হয়ে গেছে আমার জীবনের সঙ্গে ওর জীবনটা। আমি মার্গারেটকে চাই তা যেকোনো মূল্য দিয়ে। পৃথিবীর অন্য কিছুতেই আমার কোনো উৎসাহ নেই বিন্দুমাত্র। তাই পৃথিবী প্রেমের জন্য এটাই আমি বিশ্বাস করি। মার্গারেটের জন্য একান্তভাবেই প্রেম আমার কাম্য। আমি ভেতর ভেতর অস্থির হয়ে পড়ছিলাম, জানলা দিয়ে মার্গারেট আমার দিকে যতবার তাকাচ্ছিল। এটা আমি একেবারেই চাই না; হ্যারিয়েট এই মুহূর্তে আমার ঘনিষ্ঠ হোক কিংবা আমার একটা হাত ধরুক।

মুখোমুখি বসেছিল একবার হ্যারিয়েট। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো না দিল্লীতে হ্যারিয়েট, আমার বিন্দুমাত্র থাকতে ইচ্ছা করে না তোমাকে ছেড়ে।

আমি রীতিমতো আতঙ্কিত যদিও একথা বলে ফেললাম। তাহলে তো আবার বিপদ, ও যদি যেতে চায়। হ্যারিয়েট বলল, তুমি আমাকে ক্ষমা কর পিটার। কারণ আমার পক্ষে যাওয়া একেবারে সম্ভব নয়।

এর মানে অনেক কিছু হতে পারে, আমি আমার মুখের অভিব্যক্তিকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেলাম। তুমি কি পিটার রাগ করলে, হ্যারিয়েট বলে উঠল আমার একটা হাত ধরে। আমি দোতলার জানলার দিকে তাকালাম এবং সেখানে তাকিয়ে স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেললাম কারণ সেখানে মার্গারেট নেই। আমি বললাম কোনোরকমে, কাজ ক্ষতি করে তোমার গিয়ে কাজ নেই, এতে হ্যারিয়েট আমি রাগ করব কেন। চিরকালের জন্য আমি তো আর চলে যাচ্ছি না হারিয়েট। কে জানে হ্যারিয়েট কি ভাবলো। তাই সে কোনো উত্তর দিল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো তার বদলে। সামনের খবরের কাগজের দিকে হাত বাড়ালাম হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য। কিছুটা পড়ে রেখে দিয়েছি অবশ্য আগে। অন্ততঃ আমাকে এখন খবরের কাগজটা পড়ে যেতে হবে। হ্যারিয়েট যতক্ষণ এখানে থাকবে। তোমার শরীরটা এখন ভালো তো, আমি জিজ্ঞেস করলাম হ্যারিয়েটকে।

আমার শরীর এখন দারুন ভালো হেসে জবাব দিল হ্যারিয়েট।

আমি খুশী তুমি ভাল থাকলেই।

আবার বললাম একটু থেমে, আমার চিন্তা তোমার উপরেই থাকবে যদিও কোথাও না গিয়ে থাকি।

হ্যারিয়েট বলে উঠল, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না এই নিয়ে। ঠিকঠাক হয়ে বেরোতে হবে কারণ আমার স্কুলে বেরোবার সময় হয়ে যাচ্ছে।

মার্গারেটকে নিয়ে আমি কিন্তু একটু বেরোব। আমি তখন ওকে বলে উঠলাম।

ও জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু কোথায় যাবে এখন তোমরা?

কিছু কেনাকাটার ব্যাপার আছে, আমি জবাব দিলাম।

আচ্ছা, হ্যারিয়েট চলে গেল এই কথা বলে। মার্গারেট এদিকেই তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে, ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি দেখতে পেলাম।

মার্গারেটকে নিয়ে আমি মার্কেটে বেরোলাম ঠিক এগারোটা নাগাদ এবং তখন ওর পরনে ছিল গোলাপী স্কার্ট। ওর এই ফর্সা নিটোল গঠনে এই ধরনের পোষাক খুবই মানিয়েছিল। আর চোখ ঘোরাতে পারছিলাম না আমি ওর দিক থেকে। একটা ট্যাক্সি নিলাম যদিও আমাদের গন্তব্যস্থল সেখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। একটা রহস্য ওর চোখ দুটোয় রয়েছে। আমি একটা হাত রাখলাম ওর পিঠে, গাড়ির মধ্যেই। আমি রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠলাম, যখন মার্গারেট আমার কাছে একটু এগিয়ে এল। তখন এতোখানি ঘনিষ্ঠতার কারণে তার খেয়াল ছিল না যে ট্যাক্সিতে একজন ড্রাইভার রয়েছে।

মার্গারেটের নরম আঙুরের মত ঠোঁটে একটা চুমু খেলাম আমি। আমার পাশে বসে আমার বহু দিনের আকাঙিক্ষত স্বপ্নের নায়িকা আর তার কোমল অঙ্গের উত্তাপ আমি নিচ্ছি প্রাণভরে। আমার উরুর উপর ওর হাতটা রাখলো মার্গারেট। বার বার কেঁপে উঠছিল আমার সারা শরীর। আমি একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছিলাম কোনো এক অতল গহ্বরে। ভীষণভাবে টের পাচ্ছিলাম একটা নারীর স্পর্শ–সুখ কিভাবে পাগল করে দিতে পারে। তার কি একটা মনে হতে একটু সরে বসলো মার্গারেট হঠাৎ, একটু যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। ও যদি রেগে যায় তাই বলতে পারছিলাম না কিছু মুখ ফুটে। আমি দুচোখে অন্ধকার দেখবো যদি ও অভিমান করে এবং বাঁচবো না যদি ও কোনো কারণে আমার ওপর রেগে যায়।

মায়ের অসুখটা ঠিক কি রকম, হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল মার্গারেট।

আমি বললাম, একেবারে মানসিক তোমার মায়ের অসুখটা।

মার্গারেট জিজ্ঞেস করল, মন খারাপের রোগ কি?

আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল ও যেন একজন কৌতূহলীবালিকা। আর নেই সেই রহস্যময়ী

নারী। হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ, আমি জবাব দিলাম।

পাগল হয়ে যাবে কি মা?

আমি এবার ওর দিকে তাকালাম ওর প্রশ্ন শুনে। বললাম, তোমার কেন মনে এল এরকম কথা হঠাৎ করে?

মায়ের মাঝে মাঝেই তো এইরকম হচ্ছে তাই ভাবলাম, যদি আবার হলে আর না সারে, সেই কারণেই আমি তোমাকে এ কথা বললাম।

মার্গারেট ম্লান মুখে বলল, মায়ের কিছু হলে আমি পাগল হয়ে যাব, মা নেই একথা ভাবলেই আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

আমি ওর কপালে হাত রেখে বললাম, না না এতে তোমার ভাবনার কিছু নেই।

আচ্ছা মা তোমাকে খুব ভালবাসে না মার্গারেট আবার স্বাভাবিক ভাবেই বলে উঠল।

আমি জবাব দিলাম, ভালবাসে তবে তোমার মত ভালবাসে না।

এবার ও একটা কথা বলল যা খুবই অদ্ভুত শোনাল, তুমি তো বিয়ে করতে পারো মাকে।

ও বলছে কি, তবে ও আমার এবং ওর মায়ের সম্পর্কটা জেনে গেছে, সেই কারণেই আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল।

আমি বললাম, এসব যা তা কথা বলো না, আমি তোমাকেই আসলে চাই।

মার্গারেট কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, আমি একটা ডায়েরী লিখছি।

তাই নাকি খুব ভাল কথা, জয়েরীটা আমাকে দেখাবে তো।

ও ঝাঁঝিয়ে বলে উঠল, না আমি দেখাবো না তো। তোমাকে জানাবো না তো ডায়েরীতে আমার কত গোপন কথা লেখা আছে।

আমার কথা লিখেছো নাকি, ঠিক আছে দেখাতে হবে না।

মার্গারেট হেসে বলল, হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে আমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে সব কিছুই লিখে রেখেছি আমি।

আমি বললাম, আর রক্ষা থাকবে না। সর্বনাশ, এটা যদি তোমার মায়ের হাতে গিয়ে পড়ে।

ও কিছু বলতে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটা থেমে গেল কারণ আমরা পৌঁছে গেছি।

আমাদের কেনাকাটা করতে সময় লাগলো প্রায় ঘন্টা খানেক। আমরা বসলাম কাছাকাছি একটা পার্কে গিয়ে, কারণ আমাদের হাতে এখনও অনেক সময়। গাছপালা দিয়ে ঘেরা জায়গাটা। এক দম্পতি ঘনিষ্ঠভাবে বসেছিল দূরে। আমরা দুজনে বসে আছি পাশাপাশি এবং সেই সময় আমি মৃদু হাসলাম মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে। বললাম, এরপর আমরা অনেক দূর চলে যাব, আমাদের হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন আছে।

মাগরেট হেসে আমার উরুতে ওর একটা হাত রাখল। ওকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেলাম। একটু আগে আমরা খেয়ে এসেছি রেস্তোরাঁয়, তাই মুখে সেই রেস্তোরাঁর গন্ধ পেলাম। তুমি অনেকক্ষণ পরে আমাকে চুমু খেলে–এই কথা বলে ও আমার দিকে একটু সরে এল।

সামনের গাছে একটি পাখি বসেছে, অনেক রকম রঙ ছিল পাখিটির গায়ে। আমি এরকম পাখি আগে কখনো দেখিনি। এ পাখির বাস সম্ভবত ভারতবর্ষেই। আমার দিকে ঘাড় উঁচিয়ে তাকালো একবার এই অদ্ভুত পাখিটি। মার্গারেটকে ঐ পাখিটা দেখিয়ে বললাম, ঐ পাখিটার নাম– কি মিমি?

মার্গারেট পাখিটাকে দেখে বলল, আমি বলতে পারবনা পাখিটার নাম, কারণ এই পাখিটাকে আমি আগে কখনো দেখিনি এবং চিনিওনা।

আনন্দে হাত বাড়িয়ে দিল মার্গারেট। হাত বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পাখিটা উড়ে গেল। আমি তাই বললাম মনে মনে, একটা অচেনা পাখি তুমি মিমি, আমার কাছে, তুমি আমার কাছে এক রহস্যময়ী নারী, আমি তোমাকে চিনতেও পারি না এবং বুঝতেও পারি না। আমার তোমাকে খুব অদ্ভুত লাগে যখন তুমি পবিত্র সরল বালিকার মত হয়ে যাও। এটা মাঝে মাঝেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে তোমার মধ্যে অদ্ভুত এক নারী লুকিয়ে আছে। যেমন, ঠিক এই সময়, আমি বুঝতে পারছি যে আমার জীবন তোমাকে ছাড়া অচল হয়ে যাবে। কোনোদিন ছাড়তে পারবো না আমি তোমাকে। আমি নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলি তোমার দুচোখের দিকে তাকালে। আমাকে উন্মাদ করে দেয় তোমার উন্নত বক্ষ। দুরন্ত জোয়ার খেলা করে আমার রক্তে। তোমাকে নিয়ে নরকে যেতেও রাজী আমি। আরও একটি চুমু খেলাম আমি মার্গারেটকে। তারপর বললাম, আমার কাছে তুমি একটি দারুণ ছোট্ট সুন্দর পাখি।

মার্গারেট খিল খিল করে হেসে বলল, আমি তোমার নাগালের বাইরে তাহলে এমন ভাবে উড়ে পালাবো যে ধরতেই পারবে না।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরে গালে আলতো করে একটা টোকা মারলাম, আমি তোমাকে । কিছুতেই উড়ে যেতে দেব না, বুঝেছ, তোমায় আমি খাঁচায় রেখে দেব।

বাগানে বসেছিলাম ঘণ্টাখানেক এবং এরপর ওকে আমি একটা চুমু খেলাম উঠবার সময়। কমবয়সী এক যুবক বাগান থেকে বেরোবার সময় মার্গারেটের দিকে এমন লোভী চোখে তাকিয়েছিল যেটা বলার কথা নয়। ওর গালে ঠাস করে একটা থাপ্পড় কসাই বলে

মনে হল। তাকালাম একবার মার্গারেটের দিকে। যুবকটিকে মোটেই দোষ দেওয়া যায় না। কারণ মার্গারেট ওই যুবকটির দিকে তাকিয়েছিল। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম যে ও এরকম ছলাকলা কোথায় শিখল। লাঞ্চের খাবার তৈরী হয়ে গেছে যখন বাড়ি ফিরে এলাম আমরা। আমাদের জন্য তখন অপেক্ষা করছিল পরিচারিককা মহিলাটি।

.

১১.

ভারতের রাজধানী খোদ দিল্লী এসে এরপর আমরা পৌঁছলাম। এত সহজে যে ব্যাপারটা ঘটে যাবে তা আমরা ভাবিইনি। দূরের কথা তো সন্দেহ করা। আমাদের তুলে দিতে স্টেশনে আমাদের সঙ্গে এসেছিল হ্যারিয়েট। ওর চোখ দুটো ছলছল করছিল আমাদের বিদায় দেবার সময়। গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছিল না। ওর অভিভাবককে ফেলে মার্গারেট এই প্রথম দূরে চলে যাচ্ছে। হারিয়েটকে জড়িয়ে ধরে মার্গারেট কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, তুমিও চলো না মা আমাদের সঙ্গে।

হ্যারিয়েট জবাব দিয়েছিল মাথায় হাত বুলিয়ে, আমার স্কুল আছে মিমি, কটা দিন তো মাত্র, তুমি ঘুরে এসো। কতো কি দেখবে ওখানে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে, ফিরে বলেছিল ফিরে এসো কিন্তু দশদিনের মাথায়।

চুমু খেয়ে আমি ওকে বলেছিলাম, হ্যারিয়েট চিন্তা করো না, ঠিক সময় ফিরব আমি।

আমি আর মার্গারেট উঠে বসেছিলাম ট্রেনের কামরায়। এক মারাঠি দম্পতি বসে ছিল সামনের সীটে এবং জানালার পাশে বসেছিল মার্গারেট। হ্যারিয়েটের হাত নাড়া এবং দুচোখে জল আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যতক্ষণ না ট্রেনটা মিলিয়ে গেল। মার্গারেটও সমানে হাত নেড়ে যাচ্ছিল এবং অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক কথা বলেনি আমার সঙ্গে। চুপ করে বসে রইলাম অগত্যা আমি। একবার ওর পিঠে হাত দিতে গেছিলাম কিন্তু ও সরিয়ে দিয়ে বিষণ্ণ মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। আমার বিন্দুমাত্র বোধগম্য হচ্ছিল না, আমার সামনে সেই মারাঠী দম্পতি নিজের ভাষায় কি বলছিল।

শেষ পর্যন্ত আমি মননিবেশ করলাম বোম্বের স্টল থেকে কেনা একটি ডিটেকটিভ বইয়ের দিকে। বাঁদিকে আমরা বসেছিলাম এবং বেশ কয়েকজন লোক ডানদিকে বসে তাস খেলছিল। তারা প্রত্যেকেই বয়স্ক এবং তারা প্রত্যেকেই চাকুরীজীবী বলে মনে হল। এরা নিজেদের মধ্যে ইংরাজী ভাষায় কথা বলছিল। তাই আমার খুব অবাক লাগছিল ভারতীয়রা কি করে বিদেশী ভাষায় কথা বলছে এই কথা ভেবে।

দিন দুয়েকের মত লেগে গেল পৌঁছতে আমাদের এবং এর মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে মার্গারেট। আমার সঙ্গে হেসে কথা বলছে এবং হাততালি দিয়ে উঠল ভাঙা মসজিদটা দেখে। তারপর আমার কাঁধটা ধরে নিয়ে গেল জানলার কাছে এবং বলল, কি সুন্দর দ্যাখো। ট্রেন দ্রুত চলেছে বলে সেটি অদৃশ্য হয়ে গেল তাড়াতাড়ি, আমার চোখের সামনে থেকে। কোথায় তোমার সুন্দর জিনিস, আমি বলে উঠলাম তখন।

মার্গারেট আমার পিঠে একটা কিল বসালো এবং তারপর বললো, তাড়াতাড়ি আসতে হয়তো, ভীষণ কুঁড়ে তো তুমি।

আমি হেসে উঠে বললাম, তাড়াতাড়ি কতো আসব। আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল সামনে বসা সেই মারাঠী দম্পতি। তাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর জানা গেল সে ভদ্রলোক অর্থমন্ত্রকের কেরানী এবং তিনি এসেছিলেন বোম্বেতে এক আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে। প্লাটফর্ম স্পর্শ করলো যখন ট্রেন তখন সন্ধ্যা ছটা বেজেছে। তখন কিন্তু রোদ ঝলমল করছে চারিদিক। লালচে আভা যমুনার জলে। লম্বা হয়ে এগিয়ে আছে লাল কেল্লার প্রাচীর। সম্রাটের বিশাল দরবার, দেওয়ান ই–খাস, মুঘল সম্রাটের ঐতিহ্যময় নিদর্শন। তার দিকে তাকিয়েছিল মার্গারেট অবাক হয়ে। একটি মাঝারি ধরনের হোটেলে উঠলাম আমরা দিল্লীতে পৌঁছে। কাউন্টারে জমা দিলাম আমাদের জিনিষপত্র। বেশ বড়োসড়ো আমাদের কামরাটা। ভালই লাগলো মার্গারেটের হোটেলের পরিবেশটা। আমাদের নাম লেখা হল হোটলের রেজিস্টারে। বেশ সহৃদয় মনে হল কাউন্টারের ভদ্রলোককে। সে রোগা, তার চোখে চশমা এবং মুখে মৃদু হাসি। আমাদের ঘরটা চিনিয়ে দিল হোটেলের একজন বয়।

আমি বলে উঠলাম, বাঃ, ঘর তত বেশ চমৎকার। খুব ভাল লেগেছে ঘরটা তার, আমি মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। বেশ বড়োসড়ো, ডবল বেড খাট, ড্রেসিং টেবিল মাঝারী উচ্চতার এবং খানদুয়েক চেয়ার। একবার আয়নায় নিজেকে দেখে নিল মার্গারেট। আমি দরজা ভেজিয়ে দিয়েছি বয়টা চলে যেতেই, এরপর জড়িয়ে ধরলাম মার্গারেটকে পেছন থেকে।

নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে মার্গারেট বলে উঠল, তুমি খুব বাজে, এখন এসব একদম নয়, নইলে আমি পালিয়ে যাব এখান থেকে।

মেয়েটি কি বলে, আমি ওর অস্বাভাবিক ব্যবহারে শিউরে উঠলাম, আমি বুঝতে পারছি না একেবারে কিছুই। রহস্যময়ী মনে হচ্ছিল ওকে আমার সেই মুহূর্তে রীতিমতো। আমি সব কিছু ভুলে যাই, যখন ও মাঝে মাঝে আমার দিকে প্রেমের চোখে তাকায়। আমি আর আমার মধ্যে থাকি না ও যখন আমাকে আদর করে। বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেলাম আমি এখন ওর বিরক্তভাব দেখে। কিছুটা দুঃখ পেয়ে বললাম, মার্গারেট, ক্ষমা করো আমাকে, সত্যিই আমি বুঝতে পারিনি।

খাটের উপর সোজা গিয়ে শুয়ে পড়ল মার্গারেট। একটা হাসিখুশি ভাব ছিল যেন ওর চোখে মুখে। বলে উঠল একটা হাই তুলে, খুব সুন্দর হোটেলটা, এই বলে ও উঠে পড়ল এবং লাগোয়া বাথরুমের ভেতর ঢুকে পড়ল ডানপাশের একটা দরজা খুলে। কিছুক্ষণ পর আবার বেরিয়ে এসে বলল, সত্যি ভেতরটা খুবই সুন্দর।

এরপর বাচ্চা মেয়ের মত আদুরে ভঙ্গিমায় সোজা আমার দিকে এগিয়ে এল এবং জড়িয়ে ধরে বলল, রাগ করেছে কি তুমি?

আমি ম্লান হাসি হেসে ওর মাথায় হাত দিয়ে বলে উঠলাম, তোমাকে আমি ভালবাসি মিমি, তোমার ওপর রাগ করবো কেন আমি; আমি তোমায় ভালবাসি।

সে হাত বুলোতে লাগল আমার পেটে এবং বলতে লাগল, তুমি কিছু মনে করো না, আসলে অনেকদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেই কারণেই আমি মাঝে মাঝে ওরকম হয়ে যাই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঘটনাটা কি।

বিছানায় বসল এরপর ও আমাকে ছেড়ে দিয়ে এবং বলতে লাগল, তুমি আসোনি তখন, একটি বাড়িতে একটি ছেলে থাকত যা ছিল আমার বাড়ি থেকে সামান্য দুরে, এখানকারই ছেলে, আমার ওর সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কথা বলতে বলতে। হঠাৎ তারপর একদিন

এই বলেই হঠাৎ মার্গারেট গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, একদিন দুপুরবেলা তার বাড়িতে সে আমাকে হঠাৎ করে ডেকে নিয়ে গেল, ওর মা, বোন কেউ ছিল না, এবং বাড়িতেও কেউ ছিলনা। আমার ভাব ছিল ওর বোনের সঙ্গেই বেশী। ওদের বাড়িতে একদিন গেলাম।

মার্গারেট সামান্য থেমে আবার বলল, দরজা বন্ধ করে দিল ও ঘরে ঢুকে এবং আমি ভয় পেয়ে গেলাম ওর দুচোখ দেখে। আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম ও আমাকে ধরবার আগেই এবং.ও ওর প্রচণ্ড শক্তিতে আমাকে বিছানায় টেনে শুইয়ে দিয়ে তারপর চুমু খেতে লাগল আমাকে উন্মাদের মত। সজোরে একটি থাপ্পড় মারল আমাকে। যাতে আমি চুপ করে থাকি, কারণ আমি খুব ছটফট করছিলাম। ওর বাড়ি থেকে আমি যখন বেরিয়ে এলাম তখন ও আমাকে থামিয়ে বলল, আমি তোমায় শেষ করে ফেলব তুমি যদি কাউকে বল ব্যাপারটা। সেই থেকে আমি এই বলে চুপ করে গেল মার্গারেট।

ওর দিকে আমি এগিয়ে গিয়ে ওর মাথায় হাত রাখলাম হেসে বললাম, মার্গারেট আমি ভালবাসি তোমায়, তোমার ভালোর জন্য সব কিছু আমি করতে পারি।

মা আমার জন্য খুব ভাবছে না।

এরপর অন্য প্রসঙ্গে ফিরে গেল মার্গারেট।

গম্ভীর হয়ে আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ। মার কথা ওকে ভুলিয়ে দিতে হবে তা যে করেই হোক। বললাম, চিরকাল তো আর তুমি থাকবে না মায়ের কাছে। আবার একটু থেমে হেসে। বললাম, তোমার ভালমন্দের সবকিছু দায়িত্ব এখন আমার হাতে এবং আমিই এখন তোমার একমাত্র অভিভাবক।

খিলখিল করে মার্গারেট হেসে বলল, এখন থেকে তোমার উপর তো আমার শরীরেরও দায়িত্ব এবং আজ রাতে নিশ্চয় আমরা একসঙ্গে শোব।

হোটেলের একজন বয় এসে বাক্সগুলো ইতিমধ্যে দিয়ে গেল এবং মার্গারেট বলে উঠল, আমার খুব খিদেও পেয়েছে, তার আগে অবশ্য স্নান করবো।

বাক্স খুলে একটা হাল্কা নীল রঙের গাউন বের করে পরে নিল ও। আমি যে আছি সে ব্যাপারে কোনো খেয়াল না করেই ওর পরনের স্কার্টটা খুলে ফেলল ও। একটা ব্রা আর প্যান্টি শুধু পরনে, আমি ওর দিকে তাকাতে গাউনটা পরবার সময় ও আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে কেবল মৃদু হাসল। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি পাগল হয়ে যাই ওর সৌন্দর্যে। এমন কী আমি হাজার হাজার মাইল হাঁটতেও পারি ওর সঙ্গে। আমার এই যে উন্মত্ততা ওকে পাবার জন্য এটা কি সত্যিই প্রেম, না কি এটা অন্য কিছু! সত্যিকারের ভালবাসা কাকে বলে, এটা যদি ভালবাসা না হয়।

মার্গারেট স্নানের ঘরে ঢুকে গেল তার কিছু জিনিষ পত্র নিয়ে। চুপচাপ শুয়ে পড়লাম আমি বিছানায় গিয়ে। বেশ ছিমছাম এবং বড়োসড়ো ঘরটা। এতে খুব ভালও লাগছে আমার। আমার আনন্দ রয়েছে সারা দেহটা জুড়ে এবং মার্গারেটকে নিয়ে আমি কাটিয়ে দিতে চাই আমার সারাটা জীবন। আমি এই প্রথম জানলাম যে এরকম একটি শোচনীয় ঘটনা ঘটেছিল মার্গারেটের জীবনে। কোনদিন ও কাউকে বলেনি এর আগে। আমি বুজে ছিলাম চোখ দুটো এবং চোখ মেলে তাকালাম এরপর চটির শব্দে। সবে মাত্র স্নান সেরে মার্গারেট ঘরে ঢুকেছে এবং সেই মুহূর্তে খুবই অদ্ভুত লাগছে ওকে। একটা খারাপ খবর আছে, মার্গরেট ঘরে ঢুকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

আমি চমকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন কী? খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেল মার্গারেট। তারপর জানাল, ঘরের বই-এর তাকের ভিতর রয়ে গেছে আমার ডায়েরীটা, মনে পড়ল ঠিক এই মাত্র আমার স্নান করবার সময়।

আমি চমকে বললাম, তাহলে এখন যদি ওটা তোমার মায়ের হাতে পড়ে, কি হবে তাহলে?

ভাবছিতো সেই কথাই।

মার্গারেট গভীর এবং আমিও গম্ভীর হয়ে উঠে বসলাম। হ্যারিয়েট যে মানসিক বিকারগ্রস্ত ভেসে উঠল আমার মনের মধ্যে।

.

১২.

হোটেলের সব লোকেরই খাওয়া দাওয়া শেষ হয় রাত তখন বারোটায়। সিগারেট টানছিলাম এতোক্ষণ বারান্দায় বসে। আমি সিগারেট খুব একটা বেশী খাই না, আমার নেশা বলতে যা বোঝায় নেই, এক প্যাকেট বড়ো জোর সারা দিনে রাতে। তীব্র অস্থিরতা ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনের ভেতর। আমাদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশার কথা মার্গারেটের কথা অনুযায়ী তার ডায়েরীতে লেখা আছে। সেই ডায়েরীতে লিখে রেখেছে আমাদের নিখুঁত যৌন মিলনের কথা।

আমি এখন থেকেই অনুমান করছি, এই ডায়েরী যদি হ্যারিয়েটর হাতে পড়ে তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে। আমি আর কোনদিন ওখানে যাচ্ছি না, তেমন কিছু হবে না অবশ্য আমাদের এ নিয়ে। এখানে কিছু দিন কাটিয়ে কলকাতায় চলে যাব আমি মার্গারেটকে নিয়ে। ভারতের সবচেয়ে ব্যস্ত মহানগর কলকাতা। এই শহরটা খুব প্রাণোচ্ছল সারা ভারতের মধ্যেই। আমার প্রিয়তমা মার্গারেটকে নিয়ে অবশ্যই আমাকে ভারতের এই শ্রেষ্ঠ মহানগর দেখতে হবে।

ঘরের মধ্যে এলাম, আর বসে থাকতে না পেরে। মার্গারেট ঘুমোচ্ছে এবং ঘরে জ্বলছে একটি নীলচে আলো। আমি ওর মুখটা ভালভাবে দেখতে পাচ্ছিনা যেহেতু ও ডানদিকে পাশ ফিরে আছে। এক চিলতে আকাশ দেখা যাচ্ছিল ঘরের ভেতরের জানলা দিয়ে। মনে হল সামান্য মেঘলা। এক গ্লাস জল, খেলাম আমি ঢক ঢক্ করে। আবার গ্লাস টেবিলের উপর রেখে দিলাম। একটা দিক দেখা যাচ্ছিল মার্গারেটের মুখের। আমি ওর পাশে বসলাম এবং ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা। হচ্ছিল ওকে আলতো করে। চুপচাপ বসে

রইলাম খানিকক্ষণ, লোভ সংযত করে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মার্গারেটকে। একটা হাত ওর গায়ে দিলেই কী চীৎকার করে রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে এক্ষুনি, বিশ্রী ব্যাপার হবে সেটা! আলোটা নিভিয়ে দেব একবার ভাবলাম। তারপর ভাবলাম, থাক জ্বলছে যখন জ্বলুক। একটা সিগারেট ধরালাম এবং ভেতরে তখন লক্ষ্য করলাম একটা ছটফটানি। মার্গারেট চিৎ হয়ে শুল এর খানিকক্ষণ পরে। মার্গারেট খানিকক্ষণ পরে পাশ ফিরে শুলো। তাকিয়ে বলল আলতো করে, আমার সহ্য হচ্ছে না একেবারেই সিগারেটের ধোয়া। এই কথা বলে সে আবার চোখ বুজে ফেলল, মার্গারেট তেমন একটা ঘুমোয়নি এতক্ষণে সেটাই বোঝা গেল।

ওর স্বচ্ছ গাউনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দেখতে পাচ্ছি ওর স্তন দুটো পরিষ্কার ভাবে। বাদামী আভা এবং স্তনবৃন্ত দেখা যাচ্ছিল ওর স্তনের চারপাশ দিয়ে। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ওর সুন্দর নাভি, যদিও অবশ্য পরা ছিল প্যান্টিটা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওর নিটোল উরু দুটো। দাপাদাপি আরম্ভ করে দিয়েছে আমার মাথার মধ্যে পোকা গুলো। সামান্য কাঁপছিল বুঝি আমার দেহটা। ওকে ছুঁতে পারছি না আমি যদিও ও আমার খুব কাছে রয়েছে। আমার মুখে বারবার আঘাত করছে ওর নিশ্বাসটা। উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলাম আমি ক্রমশঃ। থাকতে পারলাম না আমি আর। ওর পাশে শুয়ে পড়ে আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম। কয়েক মিনিট মাত্র। মৃদুভাবে ঠেলে সরিয়ে দিল ও আমাকে। অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ দিয়ে উঃ বলে।

সরে গেলাম কিছুটা আমি। ও রেগে যায়নি, এই একটা ব্যাপারে আশা হল আমার। ও উচ্চারণ করেছে শব্দটা খুবই আদুরে এবং প্রশ্রয় দেবার ভঙ্গীতে। ওর দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইলাম আমি। কিছুক্ষণ কেটেছে মাত্র। আমাকে দুহাত দিয়ে কাছে টেনে নিল ওর

চোখ বোজা অবস্থাতেই। সত্যিই আমার পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য ওকে বোঝা। আমার জীবনে আগে এরকম রহস্যময়ী নারী আসেনি। অদ্ভুত রহস্যময় করে তুলেছে ঈশ্বর ওর মনটা। আমার পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য ওর মনের সেই অতল গভীরের নাগাল পাওয়া।

একটি ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল ঠোঁটে। আমার দিকে একবার তাকালো পিট পিট করে। কাটলো এই ভাবে কিছুক্ষণ। হঠাৎ তারপর বলল, তোমার এই ব্যাপারে উৎসাহে কি ভাটা পড়ে গেল।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম, না তো।

বোকার মত কানে শোনালো কথাটা। বলে উঠল মার্গারেট, এসো, চুপচাপ বসে রয়েছ কেন তুমি?

ওর চুলে হাত বুলোতে লাগলাম আমি এবার। ও কপালে, গালে, চিবুকে সর্বত্রই আলতো আলতো করে একটা একটা করে চুমু খেতে লাগল। ওর নিঃশ্বাস ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। আমি উন্মাদের মত ওকে চেপে ধরে চুমু খাচ্ছিলাম। আমি আর না পেরে, নরম সাদা বুকের উপর একটা হাত রাখলাম। খুলে দিলাম ওর গাউনটা এবং প্যান্টিটাও। একটা অস্ফুট শব্দ বার বার বেরিয়ে আসছিল ওর মুখের ভিতর দিয়ে। একবারে কিনারায় পৌঁছে গেছি আমরা দুজনে তখন সেই চিরন্তন স্বর্গীয় আনন্দের। একভাবে হয়ে আসছিল মাগরেটের কণ্ঠে একটা অস্পষ্ট গোঙ্গানির শব্দ। আমরা দুজনে আদিম পুরুষ এবং নারী এই মুহূর্তে, আমাদের এই দুইয়ের দেওয়া নেওয়ার মধ্যে কোনো ফাঁক নেই এবং কপটতা নেই। আমরা উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছি একে অপরকে। আমি ভালভাবে

উপলব্ধি করলাম যৌন মিলনে মানুষ সবচেয়ে বেশী আন্তরিক এই মর্মান্তিক সত্যটা। একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল আমার সারা শরীর বেয়ে। আমরা দুজনেই ক্লান্ত শরীরে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলাম চরম সুখের একেবারে শীর্ষে উঠে। কে জানে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি দুজনে।

একবারে পরের দিনে আমার ঘুম ভাঙলো বেলা নটা নাগাদ। তখনও ঘুমোচ্ছিল মার্গারেট। সত্যিই ক্লান্ত বেচারী, একটু ঘুমোক। আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। হোটেলের বয় বারদুয়েক ইতিমধ্যে আমাদের জন্য চা নিয়ে এসে ফিরে গেছে। ভারতের রাজধানী দিল্লীশহরটাকে আমাদের দূর থেকে বেশ সুন্দর লাগছিল। কতো ভালবাসা এবং ষড়যন্ত্র সেই প্রাচীন কাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই দিল্লীর আকাশে বাতাসে। একটি করে মোটা উপন্যাস লেখা যেতে পারে প্রতি মুঘল সম্রাটের ইতিহাস নিয়ে। চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম বারান্দায় বসে। দুটো ফোলাফোলা চোখ নিয়ে মার্গারেট হঠাৎ আমার পাশে এসে বসল।

জিজ্ঞেস করলাম, ঘুমিয়েছে তো ভালভাবে?

আমার দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার ও আমার প্রশ্নে। কিছু না বলে ও চায়ে চুমুক দিতে লাগলো নীরবে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে, এবার জিজ্ঞেস করলো তুমি ঘুমিয়েছো তো?

আমি বললাম, আমার ঘুম মোটামুটি ভালই হয়েছে, আজ কুতুব মিনার দেখে আসি মার্গারেট চল।

চল।

এরপর চা খেলাম, তারপর আমরা দুজনে খাবার দাবার খেয়ে নিলাম এবং তারপর তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গে একটাও কথা বলল না ও গাড়ীতে। আমি একবার, জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে মার্গারেট, কি ব্যাপার এতো চুপচাপ কেন?

কিছু হয়নি তো।

ও চুপচাপ বসে রইল, যেমন চুপচাপ বসেছিল। আমার পক্ষে ওকে বোঝা একেবারে দুঃসাধ্য আগেই বলেছি। হয়ত আজে বাজে কিছু বলে বসবে, এক্ষুনি জোর করে কিছু বলতে গেলে। ঘণ্টাখানেকেরও কম সময় লাগলো কুতুব মিনারে পৌঁছাতে। ওপরে উঠতে লাগলাম আমি, ঘোড়ানো সিঁড়ি বেয়ে। একটু নীচু নীচু ধরনের কংক্রীটের সিঁড়ি। একবারে উঁচুতে উঠতে দেওয়া হয় না। দুজনে আমরা এসে দাঁড়ালাম তার নীচের ধাপটায়। নারী পুরুষ ছিল ওখানে আরো জনাকয়েক। মার্গারেট নীচের দিকে তাকালো ওখান থেকে। হাতটা নাড়ল, তারপর একেবারে সরল বালিকার মত, ওরে বাবা, আমার ভীষণ ভয় করছে।

আমি হেসে ওর হাতটা ধরতেই ও সরিয়ে নিল ওর হাতটা। ঝাঁঝিয়ে বলল, তুমি কিন্তু আমাকে ছুঁয়ো না।

কি হল আবার।

বলতে লজ্জা হচ্ছে না কি হল।

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না মার্গারেটের কথাবার্তার মাথামুণ্ড। কি হয় কে জানে ওর যে মাঝে মাঝে। মাথায় ওর সত্যি ছিট আছে কিনা, তাই মাঝে মাঝে ভাবি। হ্যারিয়েট তো প্রায়ই উন্মাদ হয়ে যায়, ওর মা অবশ্য হ্যারিয়েট নয়, পাগলামির লক্ষণ ছিল কি তার ওর বাবা মার মধ্যে। এই সমস্ত লক্ষণ হ্যারিয়েটের মধ্যে থাকার কারণ হল যে এসবের লক্ষণ.ওদের বংশে আছে। আমি রীতিমতো বিপদে পড়ে যাব মার্গারেটের মধ্যে যদি এই লক্ষণ দেখা যায়। কুতুবমিনারের সব কিছু দেখলো মার্গারেট ঘুরে ঘুরে।

ওকে একটি ছোট্ট বালিকার মত মনে হচ্ছিল যখন ও ঘুরে ঘুরে সব দেখছিল। কৌতূহল– যেন ওর সব কিছুতেই। পাশাপাশি বিরাজ করছে যেন ওর দুটো সত্তাই। ওর একটা রহস্যময়ী রূপ নিষ্ঠুর কামপ্রবণ নারী। ওর মধ্যে রয়েছে একটি সরল সাধাসিধে পবিত্র বালিকা বা কিশোরীর রূপ যার তীব্র কৌতূহল সব কিছুতেই। কি হলো বলবে তো? আমি জিজ্ঞেস করলাম মার্গারেটকে।

মার্গারেট জবাব দিল, তুমি ভীষণ ব্যাথা করে দিয়েছ আমার দুটো বুকেই। এখন ভীষণ ব্যথা।

হাসতে হাসতে বলল খানিকক্ষণ পর, তোমাকে একটি উন্মাদ ষাঁড় বলে মাঝে মাঝে আমার মনে হয়। আমার কথা তুমি চিন্তাও করো না যখন পাগল হয়ে যাও।

আমি কিছুটা আহত হয়ে বললাম, যাড় বলছ আমাকে তুমি! ছোটো ছোটো পুতুলের মত সবকিছু দেখাচ্ছে কুতুব মিনারের উপর থেকে ভূমিতে। আমার দিকে মার্গারেট এরপর

তাকাল, তার মনমরা হাসি নেই। সে বলে উঠল, আমার সমস্ত শরীর ব্যথা হয়ে যায় তোমার ষাড়ের মত ক্ষ্যাপামিতে।

আমি উত্তর না দিয়ে দেখলাম, মার্গারেটের ঠিক পাশেই এক দম্পতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছের পুরুষটি তার স্ত্রীকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে ধরেছে। তাদের সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে বলে আমার মনে হল। আমি মার্গারেটকে দেখালাম ইশারায় এবং মার্গারেট হেসে জড়িয়ে ধরল আমার কোমরটা। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটার পর মার্গারেটের কাঁধে হাত রাখলাম। মার্গারেট এক সময় বলে উঠল, আমাকে বিয়ে করবে তুমি?

বিয়ে!

আমি ঠিক তৈরী ছিলাম না এই কথাটার জন্য। আমার ধারণা ছিল আমার সঙ্গে বয়সের ব্যবধান ওর অনেক, মার্গারেট হয়ত নাকচ করে দেবে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিলে। কিন্তু এখন দেখছি মার্গারেট নিজেই কথটা তুলছে।

এটা ওর সাময়িক আবেগ বলে আমার মনে হল। মার্গারেট বলে উঠল, অবাক হয়ে উঠলে কেন বিয়ের কথা ওঠায়, তোমার কি এর মধ্যেই মিটে গেল আমার শরীরটার প্রয়োজন।

আমি তোমাকে ভালবাসি মার্গারেট, তুমি এসব কি কথা বলছ!

ও সজোরে হেসে উঠল আমার কথায়। এক কাজ কর, আমরা তাহলে দুজনে ঝাঁপ দিই বরঞ্চ এখান থেকে।

বুঝতে পারছি আমার সঙ্গে রসিকতা করছে মার্গারেট। আমি হতবাক হয়ে যাই মাঝে মাঝে ওর কথা শুনে। চুম্বকের মত মার্গারেট আমার কাছে। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না ওকে কোনোদিন ছেড়ে থাকব! আমি পাগল হয়ে যাব সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে যদি ও কোনোদিন আমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। এমন কী আমার মাথায় তখন খুনের নেশাও চেপে যেতে পারে।

চলো এখন নামি, তোমায় ঝাঁপ দিতে হবে না। কিছুক্ষণ থেমে বলল মার্গারেট।

আমরা দুজনে আবার নেমে এলাম দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে। আমি তাজমহল দেখতে যাব এবার মার্গারেট বলল মাটিতে পা রেখে। নিশ্চয় আমরা কালই যাব।

সামনের দিকে তাকালাম মার্গারেট এবং আমি। ক্রমশঃ বেলা পড়ে আসছিল, বিকেলে সূর্যের লালচে আভা দেখা যাচ্ছে সারা আকাশ জুড়ে। গাড়িতে উঠার পর মার্গারেটের মুখে লালচে আভা এবং খুশী খুশী দেখাচ্ছিল ওকে। অনেকক্ষণ ধরে আমার আঙুল নিয়ে করতে লাগল নাড়াচাড়া। হোটেলের ঘরে গিয়ে অবলীলায় খুলে ফেলল মার্গারেট সমস্ত পোশাক।

ওর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে, দুটো হাত দিয়ে পরম আবেগে জড়িয়ে ধরলাম ওর পাছাটা। আমার দিকে ঠোঁটে রহস্যময় হাসি এবং দুচোখে ঝিলিক নিয়ে মার্গারেট তাকিয়েছিল। নগ্ন একটি স্বর্গের দেবীর মত বলে ওকে আমার মনে হচ্ছিল। আমার ভেনাসের উপমাটাই সেই মুহূর্তে মনে পড়ল। তুমি আমার ভেনাস, আমি ফিস্ ফিস্ করে বললাম। এই কথা বলার পর তখন ও আমার মাথায় হাত রাখলো।

.

১৩.

চারদিক ভাসছিল রোদে। সূর্য ঠিক তাজমহলের মাথার ওপর। তাজমহলের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি এবং মার্গারেট। আমার মাথা শ্রদ্ধায় নিচু হয়ে আসছিল, সাদা রঙের এই বিরাট মহলের দিকে তাকিয়ে। ভারতে না এলে আমার কোনোদিনই চোখে পড়তোনা এতোবড়ো একটা বিস্ময়। মার্গারেট অবাক হয়ে তাজমহলের দিকে তাকিয়েছিল এবং সেই কারণে আমি সৌভাগ্যবান। আমরা দুজনে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগলাম। একটা হাত আমার ধরেছিল মার্গারেট, আমার ওকে একটা সরল বালিকার মত মনে হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে।

আচ্ছা মমতাজকে সম্রাট খুব ভালবাসতো তাই না? মার্গারেট আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল।

হাঁ, আমি জবাব দিলাম।

মার্গারেট আবার জিজ্ঞেস করল, অনেক বয়স ছিল না সম্রাটের?

আমি উত্তর দিলাম হেসে, তাতো বলতে পারবো না।

মমতাজ কি আমার বয়েসী ছিল? মার্গারেট আবার হেসে বললো।

আমি কোনো জবাব না দিয়ে ওর দিকে তাকালাম। নীরবে কাটলো বেশ খানিকক্ষণ। একে বারে উপরে পৌঁছে গেছি আমরা। এক মহান প্রেমের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে যুগ যুগান্তর ধরে শ্বেত পাথরে এই অপূর্ব প্রাসাদ। মার্গারেটকে দেখালাম সম্রাট এবং তার প্রিয়তমা স্ত্রীর সমাধি। মার্গারেট সব কিছু দেখছিল অবাক হয়ে। কিছুক্ষণ পরে আমরা ওখান থেকে সরে এসে তাজমহলের বাইরের দিকে চাতালে বসলাম।

ছায়া আছে ওই জায়গাটায়। আমার কাছে ক্যামেরা ছিল, তাই বেশ কয়েকটি ভঙ্গীতে আমি মার্গারেটের ছবি তুললাম। ও পরেছিল একটি চকোলেট রঙের স্কার্ট। সব রঙের পোশাকই ওকে মানায়। ওর দেহের গঠন এতই সুন্দর সত্যিই অপূর্ব লাগছিল মার্গারেটকে। ওর দিকে রীতিমতো মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল বেশ কিছু পুরুষ ওর পাশ দিয়ে যাবার সময়। কিছুটা বিব্রত বোধ করছিলাম আমি। মার্গারেট কাত হয়ে শুয়ে পড়ল একটা হাতের উপর মাথাটা রেখে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে। একভাবে আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম।

মৃদু হাসলো ও আমার দিকে তাকিয়ে এবং তারপর হঠাৎই জিজ্ঞেস করল, তোমার পরিচালক বন্ধুর সঙ্গে কবে যোগাযোগ করবে?

ভাবছি আর কিছুদিন পরেই করবো।

বানিয়ে বললাম তারপরে, ও লন্ডনে ফিরে গেছে কি একটা দরকারে, কিছুদিন দেরী হবে ওর ফিরতে।

তুমি কি করে জানলে? মার্গারেট আবার জিজ্ঞেস করল।

আমাদের হোটেল থেকে আমি তো ফোন করেছিলাম।

মার্গারেট বলল, আচ্ছা, ওরা যদি আমাকে না নেয় তাহলে?

আমি সামান্য থেমে জবাব দিলাম কি আর হবে তাহলে, তুমি অন্য কোনো জায়গায় কাজ করবে কিংবা তোমাকে কলেজে ভর্তি করে দেব।

মার্গারেট বলে উঠল পড়াশোনা আমি আর করব না। আচ্ছা, দিল্লীতে আর কতদিন থাকব আমরা?

ততদিনতো থাকতেই হবে যতদিন না তোমার ব্যাপারটা ফয়সলা হচ্ছে।

সে তো মাস দুয়েক বা তিনেক তো হতে পারে। মার্গারেট বলে উঠল।

তাতে কি হয়েছে, আমরা তো নাও ফিরতে পারি যদি ইচ্ছা করি, আমি কথাটা বলে উঠলাম নিহভাবে।

হেসে উঠলাম কথাটা বলেই। ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে তারপর মার্গারেট বলল, তুমি কি বলছো?

বললাম, ফিরতে নাও পারি আমরা, বিয়ে করব আমি তোমাকে। ঘর বেঁধে থেকে যাবতারপর যেখানে হোক, খুব ভাল হবে না।

কিছুই না বলে মার্গারেট গুম মেরে রইল। চুপচাপ রইলো বেশ খানিকক্ষণ, শুয়ে পড়লো তারপর তাজমহলের চাতালের উপরে। মুখটা ভালভাবে হাত দিয়ে ঢাকলো। ওর আচার আচরণ আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম চাতালে বসে।

আমি সমস্ত ব্যাপারটা একমনে ভাবছিলাম। একেবারেই চলে এসেছি আমি ওকে নিয়ে বলতে গেলে। আমি হ্যারিয়েটকে চাইও না এবং ওর সঙ্গও আমার ভাল লাগে না। পুলিশের সাহায্য নিতে পারে অবশ্য হ্যারিয়েট বেশীদিন হয়ে গেলে। আমি কলকাতায় যাব এখান থেকে। আপাতত সেখানেই থেকে যাব একটা পছন্দমত জায়গা বেছে নিয়ে। একবার তাকালাম আমি মার্গারেটের দিকে। ওর বোজা চোখ দুটি দেখে মনে হল বুঝিবা কোনো ইংরেজ দেবী শুয়ে আছে। তোমার সেই বন্ধু যিনি পরিচালক তার নাম কি?

আমি ভেবে পেলাম না ঠিক কি বলবো। ডেভিড ম্যাকমিলান, এই নামটা হঠাৎ মনে পড়তেই আমি বলে ফেললাম।

মোট কটা ছবি করেছে সে?

আমার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ এবং সম্ভবতঃ গোটা তিনেক ছবি করেছে সে, এই কথা বলে আমি তাকালাম মার্গারেটের মুখের দিকে। এবার প্রসঙ্গ পাল্টে আবার বলল মার্গারেট, শ্বেত পাথরে তৈরী কি এই তাজমহল?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

মৃদু হেসে এরপর মার্গারেট বলল, তুমিতো আমাকে ভালবাস তাহলে তুমি কি করবে আমি মরে গেলে?

আমি বলে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে, একটি প্রাসাদ তৈরী করে দেব তোমার নামে এবং সেই প্রাসাদের সামনে আমি সবসময় বসে থাকব।

মার্গারেট সজোরে হেসে উঠল এই কথাটা শোনা মাত্রই। আমার কোলের ওপর মাথা রাখলো তারপর একটুখানি সরে এসে।

তুমি মিথ্যা কথা খুব সুন্দর করে বলতে পারো, না, মার্গারেট শেষে বলে উঠল।

চমকে উঠলাম আমি। আমার কাছাকাছি থাকলেও মার্গারেট রীতিমতো রহস্যময়ী আমার কাছে। ও আমার হাঁটুর বয়সী এটা বলা যায়। আমি সবসময়ে ঠিক মতো ওকে বুঝতে পারি না তা সত্ত্বেও। ওর আকর্ষণ, আমার কাছে ক্রমশঃ বেড়ে গেছে ওর এই রহস্যময়তার জন্যই। মার্গারেট আমাকে কি সন্দেহ করছে, আমি মনে মনে একথাই ভাবলাম। আমি রীতিমতো অসুবিধায় পড়ে যাব ও যদি আমার মিথ্যা কথাগুলো ধরে ফেলে। ও কোনোদিন পালিয়েও যেতে পারে আমার কাছ থেকে। ওকে সব সময় চোখে চোখে রাখা দরকার। আমার কোলে মার্গারেট শুয়েছিল চিৎ হয়ে। স্কার্টের খানিকটা উঠে গেছে এবং বোজা রয়েছে চোখ দুটো। সামান্য দেখা যাচ্ছে উরুগুলি। রঙ মাখনের মত। ওর দুটো স্তনের ছড়া দেখা যাচ্ছে স্কার্টের উপর দিয়ে। ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম আমি। মার্গারেট হঠাৎ বলল, আমার মাকে তুমি বিয়ে করলে না কেন।

তোমার মাকে আমি ভালবাসি না এই কারণে। আমার কথা শুনে মার্গারেট হেসে বলল, তোমার লোভটা আসলে আমার উপর ছিল তাই না।

আমি রীতিমতো আহত হলাম ওর কথা শুনে, যাকে আমি এত ভালবাসি, তার কাছ থেকে এই ধরণের কথা আমি আশা করি নি। তবুও মুখে হাসি বজায় রেখে বলে উঠলাম, তাই, কি মনে হয় তোমার?

মার্গারেট কোনো জবাব দিল না, খিল খিল করে হেসে উঠল তার বদলে। আমার বুকের বোতামটা এক হাতে খুলে দিয়ে হাত বোলাতে লাগল আমার বুকে। যতই আমি ওকে দেখছি এক অস্থির চরিত্রের নারী বলে আমার মার্গারেটকে মনে হচ্ছে। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে আমার, আমি ওকে বোঝার চেষ্টা করছি যতই। এক এক সময় আমার মনে হয় যে আমি ছাড়া ওর আর কোনো গত্যন্তর নেই। আমার ভুল কিন্তু ভেঙে যেতে দেরী হল না তার পরেই। এক দম্পতিকে আমাদের কাছ থেকে কিছু দূরেই দেখলাম, ওরা কথা বলতে বলতে পাশাপাশি হাঁটছিল এবং মাঝে মাঝেই হাসাহাসি করছিল। একবার সেদিকে তাকিয়ে মার্গারেট বলল দ্যাখো ওরা কি রকম ভাবে হাঁটছে। এই কথাটা ও আঙুল দেখিয়ে হেসে বলল আমাকে।

আমি হেসে উঠলাম মৃদু ভাবে। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ উঠে বসে মার্গারেট বলল, কিছু কিনে দেবে আমাকে, চলো আমরা ওরকম জড়িয়ে ধরে হাঁটবো।

হো হো করে হেসে উঠলাম একথা শুনে আমি। এরপর ওর গালটা টিপে ধরে উঠে দাঁড়ালাম আমি। মার্গারেটও উঠে দাঁড়িয়ে এক হাতে আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরে

চলতে থাকল। ওর কাঁধে হাত রেখে আমি আস্তে আস্তে এগোচ্ছিলাম ওর সঙ্গে। একটি প্রচণ্ড রকমের সরল এবং– উজ্জ্বল বালিকা বলে মনে হচ্ছিল ওকে তখন আমার। আমার খুব ভাল লাগে এই রূপটা ওর। এরপর একটা দোকানে এলাম আমরা তাজমহল থেকে বেরিয়ে এসে। দোকানে সবকিছুই আছে, কারণ এটি একটি স্টেশনারী দোকান। মার্গারেট একটি কাঁচের চারকোনা বাক্সের মধ্যে তাজমহল কিনলো। ঐ অপূর্ব প্রাসাদটা যেন ছোটো হয়ে গেছে, ওই বাক্সের মধ্যে। দারুণ সুন্দর। মার্গারেট উচ্ছ্বাসে বলে উঠল, দারুন সুন্দর তো জিনিসটা।

এ ছাড়াও মার্গারেট কিনল একটা গাইড বুক। দুখানা স্কার্ট কিনে দিলাম ওকে আমি পোশাকের দোকান থেকে। ও খুব খুশী এসব পেয়ে। আমি একটা হার কিনবো, একটা গয়নার দোকান দেখতে পেয়ে বলে উঠলো হঠাৎ মার্গারেট।

ওর কথা রেখে দোকানে গিয়ে আমি ওকে ওর পছন্দ মত একটা হার কিনে দিলাম। খুবই, আনন্দিত মার্গারেট হারটা পেয়ে। ওর অভিভাবক এখন আমিই। ওর সবকিছু প্রয়োজন এখন মেটাতে হবে আমাকেই। ওর সব এখন আমিই। এখন মার্গারেট আমার কাছে সব। প্রাণ ভোমরা আমার।

.

১৪.

অনেক দিন থাকা হয়ে গেছে দিল্লীতে। আমি প্রায়ই মার্গারেটকে নিয়ে বেড়াতে গেছি। সমস্ত দিল্লী শহরই আমাদের ঘোরা হয়ে গেছে গাইড বুক দেখে। এম, আন্নাদুরাই নামে

এক তামিল ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হল ওখানে। ওদের ঘর আমাদের পাশেই। ওর স্ত্রী এবং একমাত্র ছেলে রয়েছে। পঁয়ত্রিশের কোটায় বয়েস, খুব বেশী বয়স নয়। তিরিশের কোঠায় স্ত্রীর বয়স। একমাত্র ছেলে রয়েছে রাজেশ। খুব ছটফটে স্বভাবের এবং আমাদের ঘরে প্রায়ই চলে আসে। আমরা বুঝতে পারি না ওর আধো আধো কথাবার্তা। তবু ভালো লাগে আমাদের। ওর রীতিমতো ভাব হয়েছে মার্গারেটের সঙ্গে। আন্নাদুরাই দম্পতি এবং মার্গারেট উভয়েই ভাঙা ভাঙা হিন্দী জানে। তাই বেশী দেরী হলো না ওদের আলাপ জমাতে। খুবই পছন্দ ওকে মার্গারেটের। মার্গারেটকে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দেয় বাচ্চাটা। আমি বাচ্চাটাকে নিজেও ভালবাসতাম কিন্তু পছন্দ করতাম না ওকে নিয়ে মার্গারেটের বেশী বাড়াবাড়িটা। একদিন নেমতন্ন করলো আমাদের আন্নাদুরাই দম্পতি। ভারতীয়রা যে খুবই অতিথিপরায়ণ হয় তা আমি লক্ষ্য করলাম সেদিনই। কয়েকবার হ্যারিয়টের সঙ্গে অন্য জায়গায় গিয়েও এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলাম এবং তাতে মনে হয়েছিল বেশীরভাগ ভারতীয়রাই অতিথিবৎসল। একদিন রাজেশকে কোলে নিয়ে মার্গারেট আমার কাছে আসতে আমি তাকে বললাম হেসে, ওকে পেলে কোথায়, কি ব্যাপার?

মার্গারেট হেসে উঠল এবং বলল, আমার চেয়ারে বারান্দায় বসেছিল রাজেশ, আমি.তাই ওকে দেখতে পেয়ে নিয়ে এলাম।

মার্গারেট রাজেশকে আমাকে দেখিয়ে বলল, কে হয় এ তোমার? রাজেশ কিছু না বলে চুপচাপ রইলো। মার্গারেট বলল আবার, রাজেশ, বলল, তোমাকে আমি সেই যে বললাম।

আধো স্বরে রাজেশ হেসে বলল ফাদার।

ইয়েস ফাদার–এই কথা শুনে মার্গারেট হাসতে শুরু করলো খিলখিল করে এবং তার দেখাদেখি হাততালি দিয়ে হাসতে আরম্ভ করল, রাজেশও। আর আমি কে, মার্গারেট জিজ্ঞেস করল আবার।

আধো আধো গলায় রাজেশ মাদার বলে নিজেই হাসতে শুরু করলো।

ভেরী গুড, এই বলে মাদার ওর কচি গাল টিপে দিল।

মার্গারেট এরপর রাজেশকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সারা দেহে ওর চুমু খেতে লাগল পাগলের মত।

আমি বললাম, মিমি, তুমি ওকে এসমস্ত ব্যাপার শেখাচ্ছ কেন, ব্যাপার কি?

মার্গারেট বলে উঠলো কপট রাগে, বেশ করেছি, শিখিয়েছি।

মার্গারেট মাঝে মাঝে কিরকম অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে এটা আমি লক্ষ্য করছি মাঝে মাঝেই। ও রেগে যায় কেউ ওকে কিছু বললেই আমি মার্গারেটকে বললাম, বেশী মেলামেশা ওঁদের সঙ্গে করো না, আমি তোমাকে বারবার বলছি মিমি।

কেন কি হয়েছে করলে?

স্থির চোখে তাকাল আমার দিকে একবার মার্গারেট। তখন রাগের চেয়ে বিরক্তি বেশী তার দুচোখে। আমি যে ব্যাপারটা ভালভাবেই জানি, তা হল, বেশ জেদী স্বভাবের মেয়ে মার্গারেট। আমি বললাম শান্তভাবে, তুমি সবসময় ছেলেটাকে নিয়ে ওরকম করছে এতে তো অসন্তুষ্ট হতে পারে ওরা।

আমি রাজেশকে ভালবাসি এতে অসন্তুষ্ট হবার কি আছে!

ভীষণ ছেলেমানুষি মনে হল মার্গারেটের কথাটা আমার কাছে। কিছুই করার নেই আমার, কারণ আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছি, যৌবনের শেষ প্রান্তে এই সরলমনা মেয়েটির সঙ্গে। যদিও আমার হাজার ইচ্ছে থাকুক না কেন। হাজার হলেও ওরা আমাদের অপরিচিত, এটা আমি কিছুতেই বোঝাতে পারছি না ওকে। ভারতীয়রা খুব মিশুকে হয়, সাধারণভাবে যদিও দীর্ঘকাল ধরে উপনিবেশে থাকার ফলে আমাদের মত সাহেবদের সংস্পর্শে এলে ওরা একটু হীনমন্যতায় ভোগে। সেটা সময় লাগবে কাটিয়ে উঠতে। আবার বললাম আমি শান্তভাবে মার্গারেটকে, বেশী আদর তুমি রাজেশকে করো না, এটা তোমাকে আমার অনুরোধ। ব্যাপারটা ভাল চোখে নেবে না হয়তো ওরা। ওদের ইচ্ছে থাকলেও ওরা কিন্তু কিছু বলতে পারছে না মুখে।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ও বলে উঠলো একসময়, রাজেশকে আমি বেশী সময় দিচ্ছি, এটা তোমার সহ্য হচ্ছে না, আসলে তোমার হিংসা হচ্ছে।

মার্গারেট এই কথাটা বলার পরেই হেসে উঠল। আমি উপরে শান্ত থাকলাম যদিও আমি ভেতরে রেগে গেছি। আমি বলে উঠলাম হেসে, মার্গারেট তুমি সত্যিই খুব ছেলে মানুষ।

তোমার লজ্জা করে না আমার সঙ্গে প্রেম করতে, বুড়ো কোথাকার।

আমি বললাম, চল মিমি, মিছিমিছি ঝগড়া না করে কোথাও আমরা ঘুরে আসি।

রাজেশকে নিয়ে মার্গারেট বাইরে বেরিয়ে গেল একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখে। আমরা দুজনে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম ঘণ্টা খানেকের মধ্যে যদিও এর আগে একবার লালকেল্লায় গেছি, তথাপি যাত্রা শুরু করলাম লালকেল্লার উদ্দেশ্যে। মার্গারেট অবাক হল গোলাপী পোষাক পরা একটি লোককে দেখে, বলে উঠল ও, লোকটা জাদুকর।

লোকটাকে দেখলাম আমি। গেরুয়া আলখাল্লা পরে, গলায় পুঁতির মালা এবং ওর হাতে রয়েছে একটি ঝাড়ন। একাকার হয়ে গেছে লোকটার ঝাড়নের সঙ্গে ওর দাড়ির ধূসর রঙ। আমি বললাম, তুমি এরকম সাধু আগে দেখনি বোম্বেতে?

মার্গারেট বলল, আমি সাধু দেখলেও এরকম ধরনের দেখিনি।

বললাম, এরা মুসলমান ফকির, তাই টুপি পরে মাথায় মুসলমানদের মতই।

একটি ছবি তুললে ওর কেমন হয়, বলে উঠল মার্গারেট।

খুব মুস্কিল হয়ে যাবে লোকটি যদি রেগে যায়, মার্গারেটকে আমি বললাম। তাই মার্গারেট আর কিছু বলল না। আমরা এগিয়ে চললাম। আমি দাঁড়ালাম লালকেল্লার ঠিক মুখের সামনে এবং বললাম, জানতো আজাদ–হিন্দ–বাহিনীর বিচার হয়েছে এই লালকেল্লাতেই।

ওদের নাম সুভাষ বসু বলে আমি শুনেছিলাম, মার্গারেট বলল।

হিটলারের নাম তো তুমি শুনেছ?

বড় বড় হয়ে গেল মার্গারেটের চোখ দুটো এবং সে বলে উঠল, পৃথিবী জয় করতে চেয়েছিল তো জার্মানীর এই লোকটাই এবং এর সঙ্গেই তো আলাপ ছিল সুভাষ বসুর।

আমি বললাম, তুমি ঠিকই বলেছে, গান্ধীর নাম এখানকার সবাই জানে। তুমি কি শুনেছে তার নাম?

আমি শুনেছি, মার্গারেট বলে উঠল।

আমি জবাব দিলাম, সব থেকে জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি ভারতের এবং তার মৃত্যু খুব শোচনীয় ভাবে হয়েছিল এবং তাকে ভক্তি করে শহর গ্রাম সব স্থানের মানুষরা।

মা আমাকে একথা বলেছিলেন, আমি মায়ের কাছেই এটা শুনেছিলাম, এগোতে এগোতে বলে উঠল মার্গারেট।

আমরা এগোতে লাগলাম আবার কারণ ভেতরে ঢুকে অনেকখানি হেঁটে যেতে হয়। আমার পাশাপাশি হাঁটছিল মার্গারেট। আমার ফিল্মে নামার কি হলো, হঠাৎ ও বলে উঠল আমার দিকে তাকিয়ে।

কিছুটা ঘাবড়ে গেলাম আমি ওর প্রশ্ন শুনে। আমি একেবারেই ভাবতে পারিনি যে ও আমাকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করবে লালকেল্লাতেই। বন্ধুতো এখনো আসেনি তাই, আমি

বললাম, এখন তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা। আবার বললাম, অন্য অনেক কাজ আছে, ফিল্মে যে নামতেই হবে তার কোনো অর্থ নেই। কাজ তো অনেক রকম আছে।

মার্গারেট নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, কাজ অনেক রকম আছে ঠিকই কিন্তু অনেক টাকা এবং নাম হবে ফিল্মে নামলে, তা অন্য কাজ কি আছে।

নামে তোমার দরকার কি হবে।

কার না ভাল লাগে নাম। হেসে বলল মার্গারেট।

আমি বললাম, আমি তোমাকে নিয়ে সারা জীবন এভাবেই কাটাতে চাই। তাই আমার ওসব ভাল লাগে না।

বাজে কথা ছাড়ো, আমরা এগোই চলল, এবার খানিকটা রেগে মার্গারেট একথা বলে উঠল।

চুপচাপ এগোতে থাকলাম আমরা দুজনে। মার্গারেট দেওয়ান–ই–খাসের সামনে সম্রাটের সেই উঁচু সিংহাসনটার দিকে তাকিয়ে বলল, নিজের পায়ে দাঁড়াবো আমি।

মেয়েটি পাগল নির্ঘাত, আমি তাকালাম ওর দিকে। নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে এতো বড়ো একটি ঐতিহাসিক নিদর্শনের সামনে দাঁড়িয়ে। আমি কিছু বললাম না এই কথার উত্তরে। আমাদের সময় লাগল ঘন্টা দুয়েকের মত লালকেল্লা দেখতে। উপভোগ করা গেল না তেমন। মার্গারেট গম্ভীর হয়ে রইল প্রায় সারাক্ষণই। টুকিটাকি কিছু

জিজ্ঞেস করছে অবশ্য মাঝে মাঝে। জবাব দিচ্ছি আমিও। সোনার আংটি কিনে দিলাম রাস্তায় ওকে। ওর নামের আদ্যাক্ষর লেখা ছিল আংটির ওপরে। ওকে আকর্ষণ করছে এটাই। যখন হোটেলের ঘরে ফিরে এলাম তখন রাত হয়ে গেছে। সেই তামিল দম্পতি যারা আমাদের পাশের ঘরে থাকে তাদের দরজা এখনও বন্ধ মানে তারা এখনও ঘরে ফিরে আসেনি।

আমরা ডিনার সেরে পোষাক পাল্টে নিলাম ঘন্টা খানেকের মধ্যেই। আমার মুখের দিকে মার্গারেট তাকাচ্ছিল মাঝে মাঝে যখন আমরা খাচ্ছিলাম। বলছিলাম না তেমন কিছু। ও মাঝে মাঝে বলছিল অবশ্য কিছু মামুলি কথাবার্তা। সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছিলাম আমি। আমরা ঘরে ফিরলাম খাওয়া শেষ করে। মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম ওকে অপরূপ দেখাচ্ছিল সাদা রঙের স্বচ্ছ গাউনে। আমি পাগল হয়ে যাই মার্গারেটের ঐ অপরূপ রূপ দেখলে। তখন আর নিজের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না আমার। ওর শরীরের ভিতরের প্রতিটি রেখা দেখা যাচ্ছে গাউনের ভিতর দিয়ে। মার্গারেট বিছানার উপর বসে হাই তুললো দুহাত উপরে তুলে দিয়ে। আমি একটা চেয়ারে বসে একটা ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে বার বার তাকাচ্ছিলাম ওর দিকে। আসলে আমি বোঝাতে চাইছিলাম মার্গারেটকে যে, আমি ওর উপর অসন্তুষ্ট ও সেটা বুঝুক। মার্গারেট মুড়ে বসলো পা দুটো। বেশ শব্দ করে দুহাত উপরে তুলে ও হাই তুললো, ওর দিকে তাকালাম আমি এবার। ওকে যা বলার তা আমি বলতে চেষ্টা করলাম আমার চোখ দুটো দিয়ে। মৃদু থেমে বলল মার্গারেট, কতদিন এখানে থাকব বলতে আমরা?

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, বেশীদিন নয় আর।

যাবো কোথায় এবার আমরা?

জবাব দিলাম আমি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে, কলকাতায় যাবার ইচ্ছা আছে একবার।

চিৎ হয়ে শুয়ে মার্গারেট বলল, বোম্বে তাহলে যাচ্ছি না আর আমরা।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, না। ও টান টান হয়ে আছে এবং ওর শরীরের চড়াই উত্রাই এক মোহময় জগতে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। দুর্বল হয়ে পড়ছি আমি ক্রমশ। ওকে বললাম, আমরা কলকাতাতে থাকবে এবং একটি চেম্বার করবো আমরা কলকাতাতে।

তোমার হোটেল দুটোর কি হবে, মার্গারেট জিজ্ঞেস করল।

বিক্রি করব ও দুটো।

আমি মার্গারেটের দিকে তাকিয়েছিলাম। কিছুদিন আগে রোগাটে ছিল কিন্তু আগের চেয়ে ওর শরীরে এখন লাবণ্য এসেছে। আমার আগে ওর চেহারাটা ধারালো মনে হলেও ঠিক এই মুহূর্তে সামান্য মেদ জমেছে ওর শরীরে। ক্রমশ শরীর আরো লোভনীয় হয়ে উঠছে। শরীর আর মনে বরং আমিই দিনের পর দিন ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। আমার দিকে তাকিয়ে বলল কাত হয়ে, একটু টিপে দাও তো আমার কপালটা, বড্ড ব্যথা করছে।

আমি বিছানার উপর বসলাম এগিয়ে গিয়ে। ওর কপালে একটা হাত রাখলাম। এরপর ওকে একটা চুমু খেলাম আমি কিছুক্ষণ ওর কপালটা টিপে দেবার পর। আস্তে আস্তে ঘোর লাগছে মার্গারেটের দুচোখে। ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে সরিয়ে দিলাম আমি ওর শরীরের আবরণ। হাত রাখলাম ওর বুকের ওপর। ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়ার পর ওর শরীরে আবরণ, আমাকে ওর শরীরের মোহময় আবরণ এবং সৌন্দর্য বাস্তব পৃথিবী থেকে এক অপূর্ব মায়াময় স্বর্গলোকে নিয়ে যাচ্ছিলো ক্রমশঃ। কপালে লাগছিল আমার ওর নিঃশ্বাস। ঘরের আলোটা দিলাম নিভিয়ে আমি হাত বাড়িয়ে।

.

১৫.

দিন দুয়েক আগে চলে গেছে সেই মিল দম্পতি। আমি খুব কমই দেখেছি এইরকম ভদ্র পরিবার। এই সত্যটাই আবার তুলে ধরলো যে ভারতীয়রা অতিথিপরায়ণ। ওখানেই সরকারী চাকুরী করেন ভদ্রলোক। ভালই জানেন ইংরাজী, আমরা কথাবার্তা বলেছি নানা বিষয় নিয়ে। ভদ্রলোকের একটি বিষয় ভালরকম ভাবে জানাশুনো রয়েছে, তাছাড়া বেশ ভালরকম ওয়াকিবহাল ইংরাজী ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কেও। ভদ্রমহিলাও শিক্ষিতা ছিলেন মোটামুটি।

ওরা চলে যেতে খুবই খারাপ লাগছিল আমার। অনেকটা ভেঙে পড়ল মার্গারেট বিশেষ করে। ও প্রায়ই রাজেশকে নিয়ে সব সময় থাকতো। অসম্ভব টান মার্গারেটের বাচ্চার ওপরে। বাচ্চাদের ওপর টান থাকে অবশ্য প্রায় সব ভারতীয় মহিলাদেরই। মার্গারেট

ভারতীয় নয় যদিও তবু ভারতীয়দের এই গুণটা পেয়েছে খুব বেশী পরিমাণে। মার্গারেট কেঁদেই ফেলেছিল যেদিন রাজেশরা গেল সেদিন ওকে কোলে করে। গুম হয়ে কাটালে পরপর দুদিন। আদর করার চেষ্টা আমি মাঝে মাঝে করলেও ও নিস্পৃহ থাকার জন্য বেশীদূর এগোতে পারিনি। আমার কাছে খুবই অস্বস্তিকর ওর একরকম অবস্থাটা। ও আমাকে একেবারে আমলই দেয় না এই সময়টা। গ্রাহ্য করে না। উল্টে আমাকে কড়া কথা শোনায় আমি যদি এগিয়ে যাই। খুব একটা এগোতে পারি না কারণ আমি ওকে ভয় পাই। কিছু হলেই ও আমাকে পালিয়ে যাবার ভয় দেখায় ইদানীং। একাধিক বার আমার দেখা হয়ে গেছে দিল্লীর প্রায় সব জায়গাই। আমার কাছে এখন অনেক পরিচিত হয়ে গেছে দিল্লীর রাস্তাঘাটও। এখানেই থেকে যাব একবার মাঝে ভেবেছিলাম এবং চেম্বার করব এখানেই। এই ব্যাপারটা কিন্তু বাতিল করে দিলাম একটা কারণে। আমরা দিল্লীতে এসেছি হ্যারিয়েট সেটা জানে। ও আমাদের খোঁজে এখানে চলে আসতে পারে যে কোনো সময়। আমার সারা দেহে কাঁপন লাগে হ্যারিয়েটের মুখটা মনে পড়লেই। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছেও সারা শহর তোলপাড় করে দেবে আমাদের খোঁজে। খবরের কাগজ সামনে, চোখে পড়ল একটা আলোচনা। বিদেশে নাকি দারুণ সমার্লোচনা পেয়েছে এখানকার একটি বাংলা ফিল্ম। এত সম্মান পায়নি এর আগে ভারতের কোনো ছবি। পথের পাঁচালি ছবিটার নাম। একজন অখ্যাত বাঙালী যুবক ছবিটির পরিচালক। কলকাতায় গিয়ে ছবিটা দেখব বলে ভাবলাম। হিন্দী এখানকার প্রধান ভাষা। যখন বোম্বেতে ছিলাম তখন দু একখানা হিন্দী ছবি দেখেছি। এখানকার ছবি সম্পর্কে আমার ধারণা তাতে খুব খারাপ হয়ে গেছিল। বলার নয়, সে এতো বাজে ছবি। যাকগে, নিশ্চয় দেখবো এই ফিল্মটা। ভারতের বেশীর ভাগ সংস্কৃতি কলকাতাই ধরে রাখে বলে শুনেছি। বুঝতে পারবো নিশ্চয় ওখানে গেলেই, একটা ছবি যেন ভাসছে আমার চোখের সামনে।

রাস্তা দেখা যায় দূরে তাকালেই। ভিড় গাড়ি ঘোড়া এবং পথচারীর। এখনও ফাঁকাই লাগছে অবশ্য এই জায়গাটা।

এখনতো লন্ডন শহরে ক্রমশই ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। আমার মুখোমুখি এসে বসলো মার্গারেট স্নান সেরে একটা গাউন পরে। ওকে অপূর্ব সুন্দর লাগছিল সদ্য স্নান সারা অবস্থায়। পবিত্র ভাব একটা ওর মুখের মধ্যে।

আমি মৃদু হাসলাম মার্গারেটের মুখের দিকে তাকিয়ে। মনটা ভাল এখন মার্গারেটের। হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ঠিক ঘুমোতে পারিনি কাল রাতে।

ওর কাঁধে হাত রেখে কে বলে আমি জিজ্ঞেস করে উঠলাম। শরীর কি খারাপ লাগছিল তোমার।

আমার জামার বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মার্গারেট মৃদু হেসে বলল, বুঝতে পারছি না আমি ঠিক। আমার শরীর তো ভালো আছে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কোথায় যেন একটা বিষণ্ণতা লেগে আছে ওর মুখের মধ্যে। খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার ভেতরটায়। কি অবিচার করেছি আমি মার্গারেটের ওপরে। আমি ভালবাসি তো ওকেই। আমি সবকিছু করতে রাজি আছি ওর জন্যে। আমি ভালবাসা পাইনি এর আগে কোনো নারীর কাছেই। আমাকে সত্যিই ভালবাসে কিনা মার্গারেট সেটা অবশ্য আমি জানি না। কিছু দিন আগে আমাকে পাগল করে দিয়ে কিশোরী ক্যাথরিন আমার রক্তে হিল্লোল তুলেছিল। যথারীতি আবার ভুলেও গিয়েছিল তারপর। ওর এবং আমার ক্ষেত্রেও সাময়িক আবেগ ছিল ব্যাপারটা। উত্তেজনা ছিল

কিশোর বয়সের, তাতে ছিল না কিন্তু কোনো প্রেম। আমাকে ভালবাসেনি কিন্তু ক্যাথরিন, এরপর আমার জীবনে এসেছিল সোফিয়া। স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলাম আমি ওকে। বিশ্বাসঘাতকতা ছিল কিন্তু সোফিয়ার রক্তে। আমার কাছে এসেছিল ও নিছক এক ধরনের মোহে। আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল ওর অস্থির স্বভাবই। আমরা বিয়ে করেছিলাম। বারবার মিলিত হয়েছিলাম দুজনে, আমাকে কিন্তু সোফিয়া ভালবাসেনি। অবশ্য ওর মতো বিকারগ্রস্ত একজন নারীর কাছে ভালবাসা আশা করাও ঠিক নয়। ভুল আমি করেছিলাম এবং ফলও পেয়েছি আমি তার হাতে হাতে। এরপর আমার জীবনে এল হ্যারিয়েট। আমাকে পেতে চেয়েছিল হ্যারিয়েট যৌবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে। আঘাত পেয়েছে হ্যারিয়েটও জীবনে। বর্তমানে অনিবার্য হয়ে উঠতে হয়তো হারিয়েটের আসাটা। আমি সবকিছু ভুলে গেলাম কিন্তু মার্গারেটকে দেখার পর। আমার মত পুরুষ যার যৌবন শেষ হয়ে গেছে তাকে পাগল করে তুলল মার্গারেট। ওর জোয়ারের টানে ভেসে গিয়ে আমি সবকিছু ভুলে গেলাম। আমাকে ভালবাসেনি হ্যারিয়েট কিন্তু ও কেবলমাত্র আমাকে চেয়েছিল একটা অবলম্বন হিসাবে। আমাকে পেয়ে চরম বেড়ে গিয়েছিল ওর তীব্র যৌনক্ষুধা। সেটাই মেটাবার ছলাকলা ওর প্রেমের অভিব্যক্তি। ডাক্তার হলেও আমি মনের কারবার নই।

আমাকে মৃদু ধাক্কা দিল মার্গারেট হাত দিয়ে, তারপর বলল, কি ভাবছো?

প্রথমে চমকে উঠলাম আমি এবং তারপর বললাম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, কই কিছু ভাবি নিতো।

চেপে যেও না আমাকে।

আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো মার্গারেট, সজোরে হেসে বলে উঠলাম আমি, আমাকে বিশ্বাস করছো না তুমি।

তোমাক বিশ্বাস করেছি বলেই আমি আজ এখানে। মার্গারেট গম্ভীর হয়ে বলে উঠল হঠাৎ।

ওর দিকে তাকিয়ে আমি হেসে বললাম, না, মিমি, না বলার কিছু নেই, আমাকে কিছু একটা করতে হবে কলকাতা গিয়ে, ভাবনা এটাই যে আমার টাকা পয়সা ক্রমশঃ কমে আসছে।

অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে রইল মার্গারেট একথা শুনে।

আমি চাকরী করব কলকাতায় গিয়ে, তারপর সে বলে উঠল কিছুটা নিস্পৃহ স্বরে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। মাঝে মাঝে লোকজন যাওয়া আসা করছিল করিডোর দিয়ে। নেহাৎ কম ছিল না বিদেশী লোকজন। হঠাৎ বলে উঠল মার্গারেট, আমার শরীরটা খুবই খারাপ লাগছে।

চিন্তিত হয়ে ওর কথায় বলে উঠলাম আমি, জ্বরটর বোধ কর নাকি মাঝে মাঝে?

সেরকম কিছু বোধ করিনা, তবে মাঝে মাঝে খেতে পারি না।

ওর চোখে সামান্য কালি পড়লেও মাঝে মাঝে তা তেমন বোঝা যায় না। পেটটা যদিও সেরকম উঁচু বলে মনে হচ্ছিল না। ইদানীং অবশ্য লাবণ্য একটা এসেছে মার্গারেটের শরীরে। এবার আরো একটা চিন্তা এসে হাজির হলো আমার মনের মধ্যে। তাহলে তো একটা সমস্যা বাড়বে ও যদি সন্তান ধারন করে। কে জানে এদেশে এসব ভাল ভাল ওষুধ আছে কিনা। সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভেবোনা। তাই বলে উঠলাম।

মার্গারেট বলল, তুমি যখন বাইরে যাবে তখন আমার জন্য শেক্সপিয়ারের কিছু গল্পের বই এবং কিছু ম্যাগাজিন কিনে আনবে, যা লেখা আছে কমিক্সের উপর।

আমি বললাম, আনবো।

এরপর চুপচাপ চা খেলাম আমরা দুজনেই আমি ওকে হাসাবার জন্য হাসির কথা বলছিলাম মাঝে মাঝে এবং তাতে ও হাসছিল। ও যেন কোনো মতে দুঃখ না পায় সেটাই আমি তখন চাইছিলাম। ওর সবকিছু এখন আমিই। খেতে খেতে ওর দিকে তাকাতেই আমি নিজের ভেতর ভেতর একটা উত্তেজনা বোধ করছিলাম। সংযত রাখতে পারছিলাম না আমি নিজেকে। প্রায়ই যখন এরকম হয় তখন মনকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না আমি ভীষণভাবে উত্তেজনা পেয়ে বসে আমাকে এবং অসহায় বোধ করি তখন আমি নিজেকে।

মিমি ঘরে এসো আমি বললাম মার্গারেটকে। আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ার পর কোনো কথা না বলে মার্গারেটকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে একটা চুমু খাবার পর খেয়াল হল যে বন্ধ করা হয়নি দরজাটা। আমি এক ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে জড়িয়ে ধরলাম

মার্গারেটকে। একটু বিরক্ত হয়ে ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিয়ে মার্গারেট বলে উঠল, এই সাত সকালে কি হচ্ছে, সে এই কথাটা বলল গোল গোল চোখ করে।

প্লীজ মিমি আমি আর পারছি না।

মার্গারেট আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হেসে বলে উঠল, আমার আর এখন ওসব ভাল লাগছে না। ওর এই রহস্যময় হাসির অর্থ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। মার্গারেট বিছানায় বসেই আমাকে বললো, এগিয়ে এসো।

আমি ওর সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই আমার চরম উত্তেজনার সমাপ্তি ঘটলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমার কাছে এসে বসলো মার্গারেট মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পোষাকটা বদলে। দুজনে চুপচাপ রইলাম খানিকক্ষণ। সশব্দে উড়ে গেলো একটা এরোপ্লেন আমাদের মাথার খুব কাছ দিয়ে। এরকম হয়ে গেলে কেন তুমি, হঠাৎ মার্গারেট বলে উঠলো।

বললাম, আমার মাঝে মাঝে কেন জানিনা ওরকম হয় এবং তার ফলে আমি আর ঠিক থাকতে পারি না।

.

আমাকে কবে বিয়ে করছে, হঠাৎ ও বলে উঠলো লাঞ্চের সময়। একটি মুরগীর ঠ্যাং চিবোচ্ছিলাম এবং ওর প্রশ্ন শুনে ওর দিকে তাকালাম তখন অবাক হয়ে। আটকে রইলো

ঠ্যাংটা মিনিট দুয়েকের জন্য। মৃদু হেসে তারপর ঠ্যাং একহাতে বের করে নিলাম এবং তারপরে বললাম সমস্ত ব্যবস্থা করবো আমি কলকাতায় গিয়ে।

মার্গারেট বলে উঠলো হেসে, বুড়ো হয়ে গেছ তুমি, কি হবে বিয়ে করে, তুমি আমার বাবা হয়ে যেতে যদি এতদিনে মাকে বিয়ে করতে। আমার কপাল সত্যিই মন্দ কারণ যার বাবা হওয়ার কথা ছিল, এখন সে হতে চলেছে আমার স্বামী।

তোমার কপাল মিমি সত্যিই খারাপ, তুমি ভারতীয়, কিন্তু ভারতীয়রা চায় বুড়ো স্বামী। তারা কামনা করে শিবের মত বুড়ো স্বামী, বুড়ো দেবতা তো তিনি।

হেসে উঠলাম আমি সজোরে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো মার্গারেট।

.

১৬.

আমাদের থাকার মেয়াদ আরো কিছু বাড়িয়ে দিতে হয়েছে। প্রথম কারণটা হল, হঠাৎ মার্গারেটের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং এর দ্বিতীয় কারণটা হল, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। অনেকদিনের পুরনো বন্ধু আমার। স্কুলে পড়েছি ওর সঙ্গে ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় ডাক্তারি পড়তে গিয়ে। অবশ্য বাইরে যোগাযোগ দীর্ঘদিন ধরেই ছিল। ও পড়াশুনো করেছিল অবশ্য ইংরাজী সাহিত্য নিয়ে। এখন অবশ্য ও যুক্ত আছে

লেখালেখির সঙ্গে। কাগজের সাংবাদিক এখন ও ওখানকার। ভারতবর্ষ সম্পর্কে জানবার জন্য ও এসেছে এখানে। ওর একটা উপন্যাস লেখারও ইচ্ছা আছে এই পটভূমিতে। আমি সামনের চেয়ারে বসে আছি একদিন হোটেলের রিসেপশান কাউন্টারে। বিশেষ করে বেলার দিকে ওখানে গিয়ে আমি প্রায়ই বসি। মাথায় টুপি এবং পরনে নিখুঁত পোষাক নিয়ে এক যুবক ঢুকলো। ওর দিকে নিস্পৃহভাবে আমি তাকাতে ও আমার দিকে একবার টুপিটা খুলে চোখ কুঁচকে বলল, পিটার না।

এই বিদেশ বিভুয়ে কে আমাকে নাম ধরে ডাকতে পারে সেটাই আমি অবাক হয়ে ভাবলাম। ওর দিকে আমি তাকাতে ও একেবারে আমার সামনের দিকে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাল করে দেখে ভাবলাম একজন যুবক কিন্তু তারপরে দেখলাম এঁর যৌবন শেষ হবার মুখে কিন্তু বাঁধুনি খুব সুন্দর। যা বয়সকে একবার পেছনে ফেলে দিয়েছে। উৎফুল্ল হয়ে আমি বলে উঠলাম, ফ্রেডি!

হ্যাঁ, আমি ফ্রেডি উইলসন, তোমার আদি এবং অকৃত্রিম বন্ধু।

তুমি তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছে, আমি বলে উঠলাম হেসে।

ওকে বসতে বললাম আমি। আমার কামরায় আমি ওকে নিতে যেতে চাই না এই মুহূর্তে কারণ আমি জানি না যে মার্গারেট এই মুহূর্তে কিভাবে রয়েছে।

আমাকে জিজ্ঞেস করল ফ্রেডি, পিটার তোমার কি ব্যাপার, তুমি কোথায় রয়েছ এখানে?

আমি ওকে বললাম আমার কামরার নম্বর। দোতলাতে আমি থাকি।

এই হোটেলেরই একেবারে শেষের কামরাতে ফ্রেডি থাকে একতলার ঘরে। আমি যদিও যেতে চাইছিলাম না কিন্তু জোর করে ও ওর ঘরে আমাকে নিয়ে গেল। ওর ঘরটা একেবারে শেষ প্রান্তে। যখন ঢুকলাম তখন দেখলাম এ ঘরটা বেশ ভালো একটা ফোয়ারা রয়েছে সামনেটায়। এখান থেকে ভাল দেখা যায় বাগানের বেশ খানিকটা। এ জায়গাটা ঠিক চোখে পড়েনা আমাদের বারান্দা থেকে। চেয়ারে বসলাম এবং ঠিক তখুনি ফ্রেডি গিয়ে দুটো চা বলে এসেছে। বিছানায় বসে জিজ্ঞেস করলো ফ্রেডি, তুমি এখানে কবে এবং কি ব্যাপারে এসেছো? :

আমি বললাম, কয়েকমাস হলো এখানে এসেছি।

এখানে চেম্বার টেম্বার করোনি। আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না অবশ্য তোমার ডাক্তার হয়ে বেরোনোর পর। নিজেই আবার বললো একটু থেমে, আমাদের দুজনের পেশা আলাদা ছিল, একটা কারণ ছিল সেটাও, তোমাদের তো এখানে এবং বোম্বেতে একটি হোটেল ছিল।

সেগুলি কর্মচারীরাই চালায়, এখন বিক্রী করে দেবো ভাবছি।

কোথায় প্র্যাকটিশ করবে ঠিক করেছ?

কলকাতায়, আমি জবাব দিলাম।

ও উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং বলল, আমারও যাবার ইচ্ছা আছে, কারণ জায়গাটা চমৎকার, তবে শান্তিনিকেতনে যাবার ইচ্ছা আছে আমার, আমি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়েছি। আমি যে উপন্যাস লিখবো ভাবছি ভারতকে নিয়ে, কলকাতা আর শান্তিনিকেতনের বেশীর ভাগ তথ্য থাকবে তাতে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে, তোমার উপন্যাস কটা বেরিয়েছে এখনও পর্যন্ত?

দুখানা বেরিয়েছে। আমি কাগজের সাংবাদিক, সুতরাং রীতিমতো ব্যস্ত জীবনে আমাদের লিখতে হয় সেটা তো বুঝতেই পারছ। এখানে এসেছি আমি খবরের কাগজের কাজে। একটু থেমে বলল, বিয়ে করেছ, এবার খবর বলো তোমার।

কি বলবো তা আমি ভেবে পেলাম না। ভাবলাম কিছুক্ষণ, তার পরে বললাম, করেছিলাম বিয়ে, কিন্তু সেটা তো ডিভোর্স হয়ে গেছে। একটু অস্বাভাবিক ধরনের ছিল আসলে ওর শারীরিক চাহিদা। ও একই সঙ্গে একাধিক পুরুষের শরীর কামনা করত মানসিক দিক থেকে। ব্যাপারটা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি কোনো মতেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ফ্রেডি, পরিষ্কার ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে উঠল, আমার ক্ষেত্রেও একই কেস, তবে তোমার একটা হলেও আমার অবশ্য পর পর দুবার বিয়ে হয়েছিল। একটু অপ্রকৃতিস্থা ছিল আমার প্রথমা স্ত্রী এবং এটা আমি টের পেয়েছিলাম কয়েক মাস পর। যৌন ব্যাপারে একেবারে ঠাণ্ডা ছিল অবশ্য আমার দ্বিতীয় স্ত্রী। এটা টেকেনি কারণ টের পেয়েছি বিয়ের পরেই। অবশ্য আমি চেষ্টা করেছিলাম নানাভাবে কিন্তু সেটা হয়নি। হাল ছেড়ে দিয়েছিল ডাক্তাররা। মা ছিল মেয়েটির।

ছেলেবেলায় ওর কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল কিনা সেটা ওর মা কিন্তু কিছু বলেনি। পিটার বিয়ের আগে কিন্তু টের পাইনি একদম ব্যাপারটা। ফ্রেডি এই কথা বলে থামলো।

বিয়ে নিয়ে করার কথা ভাবছে নাকি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমি এখন এসব ভাবছিনা ভাই, খুব বেঁচে গেছি একটা ব্যাপারে যে আমার বাচ্চাটাচ্চা কিছু হয়নি।

ঘাড় নাড়লাম আমি, আমারও তা হয়নি বটে, একটা প্রেম করছি বটে তা বলতে পারো।

ফ্রেডি চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে বলল, তাই নাকি, সে কোথায় এখন?

আমি বললাম ওর দিকে তাকিয়ে, সে এই হোটেলেই আছে, বাড়ি ওদের বোম্বেতে, খুব একটা বেশী নয় ওর বয়স। বলতে পারো সদ্য যুবতী একেবারে। এর সঙ্গেই কাটাবো ভাবছি আমার বাকি জীবনটা। যদি সব কিছু ঠিকটাক চলে।

উঠে দাঁড়াল ফ্রেডি, চলো আলাপ করে আসি তাহলে।

ওকে নিয়ে যাওয়াটা আমি মনে মনে অবশ্য চাইছিলাম না। রীতিমতো ভয় করি আমি মার্গারেটকে যদিও ওকে আমি মনে মনে ভালবাসি। ও যে কখন কি করে বসে কোনো ঠিক নেই। চলো তবু আমি বলে উঠলাম।

ফ্রেডি এগোতে আরম্ভ করল এরপর আমার সঙ্গে। দোতলায় চলে এসে দেখলাম যে একটা চেয়ারে বারান্দায় বসেছিল মার্গারেট। সে ফিরে তাকাল আমাদের পায়ের শব্দ

শুনে। পরিচয় করে দিলাম মার্গারেটকে এবং তারপর বললাম ফ্রেডি উইলসন আমার বন্ধু, এই হোটেলেই উঠেছে। আগে চোখে পড়েনি। এ একজন বিখ্যাত সাংবাদিক এবং লেখক। ফ্রেডির দিকে তাকালাম এবং বললাম, এর নাম মার্গারেট, আমার সবকিছুই হল এ।

মার্গারেট উঠে দাঁড়াল এবং ওর সঙ্গে করমর্দন করল এবং তারপর বলল মৃদু হেসে, বসুন, খুব খুশী হলাম মিঃ উইলসন, আপনার সঙ্গে আলাপ করে।

আমি এবং ফ্রেডি দুজনেই বসলাম। তারপর ও বলল হেসে, আমাকে বেশী সমীহ করার দরকার নেই, আমি পিটারের যেমন বন্ধু তেমনি তোমারও।

ঠিক আছে।

মার্গারেট একটু থেমে আবার বলল, মিঃ উইলসন, আপনি চাকরী করেন কোন্ কাগজে?

হেসে ফ্রেডি বলল, আমি মিঃ উইলসন নই, আমি শুধুই ফ্রেডি, বললাম না।

মার্গারেট হেসে বলল, শুধু ফ্রেডি বলব ঠিক আছে, তুমি যে কাগজের সাংবাদিক তার নাম কি?

ফ্রেডি জবাব দিল, কাগজের নাম লন্ডন টাইমস।

মার্গারেট বলে উঠলো, ওটি বুঝি ওখানকার কোনো নামকরা কাগজ।

নামকরা কাগজ ওটি, তবে আমি এমন কিছু কেউকেটা নই, সামান্য সাংবাদিক আমি, আমার উপর ভার এখন পুরো দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার।

এবারে আমি বললাম, ফ্রেডি তাহলে তোমার এত দায়িত্বের মধ্যে লেখবার সময় কখন পাও?

ফ্রেডি বলল, ওর মধ্যে থেকেই সময় বার করে নিতে হয়।

মার্গারেট বলল, এখনও পর্যন্ত কটা বই বেরিয়েছে তোমার?

ফ্রেডি জবাব দিল, দুটো বেরিয়েছে, কিন্তু বিক্রী সেরকম একটা কিছু হয়নি, একটি নিটোল প্রেমের গল্প যাতে দুই প্রেমিক এবং এক প্রেমিকার মধ্যে টানাপোড়েন। এটি সে বিষয় নিয়েই লেখা যে আমাকে বেশ কিছু অদ্ভুত অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে। মোটামুটি দুটো বই খুবই প্রশংসিত হয়েছিল সমালোচকদের দ্বারা।

বই দুটোর কি নাম? মার্গারেট বলে উঠল হেসে।

মিসেস হ্যারিসনের প্রেমকাহিনী একটির নাম এবং আমার না বলা গল্প আরেকটির নাম।

মার্গারেট বলল, দুটো নাম তো বেশ ভাল, আমাকে একবার প্রেমের উপন্যাসটি দিও, আমি পড়ব একবার।

খানিকটা থেমে কথাগুলি বলছিল মার্গারেট। ওকে খুব ক্লান্ত লাগছিল, ওর কপালে আমি ফ্রেডির সামনেই হাত রাখলাম এবং বললাম, তোমার জ্বরটর হয়েছে নাকি?

হেসে মার্গারেট বলল, অত উতলা হবার কোনো কারণ নেই। তোমাকে আমি সহজে ছেড়ে যেতে পারব না।

ফ্রেডি এবং মার্গারেট দুজনে হেসে উঠলেও আমি কিন্তু চুপচাপ রইলাম।

.

১৭.

পনের দিন কেটে গেছে এর মধ্যে। আমাদের আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে ফ্রেডি। ওর সঙ্গে এখন মার্গারেট আরো সময় কাটায়। ওকে পড়তে দিয়েছে ফ্রেডি ওর সেই প্রেমের উপন্যাসটা। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি যে, আমার ভেতরে একটি সূক্ষ্ম প্রেমের ঈর্ষা জন্ম নিচ্ছে। ফ্রেডি আমার এবং মার্গারেটের উভয়েরই বন্ধু। ফ্রেডির চৌখস চেহারা এবং ও জমিয়ে কথা বলতে পারে। কিন্তু ওকে আমার সাহিত্যিক বলে মনে হয় না। ওকে খানিকটা তুলনা করা যেতে পারে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সঙ্গে। ফ্রেডির ঠিক বিপরীত আমি, কারণ আমি কথা কম বলি এবং আমার চোখে মুখে একটা আবরণ থাকে সবসময়। ফ্রেডি একটি সরল শিশুর মতো এবং ওর মধ্যে যে কোনো দাম্ভিকতা নেই সেটা মানতেই হবে।

মার্গারেটের মন জয় করতে চাইছে ফ্রেডি খুব সুকৌশলে এটাই আমার মনে হচ্ছিল। ফ্রেডি নিজেই প্রস্তাব দিল একদিন, পিটার চল তুমি, আমি এবং মার্গারেট একদিন কোথাও বেড়িয়ে আসি। এতে মার্গারেট রাজী আছে। দোনামনা আমিও খানিকটা করেছিলাম কিন্তু আমার কোন বাধা টিকলো না ফ্রেডি এবং মার্গারেটের যুগপৎ উৎসাহে। তিনজনে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমার প্রায় সব জায়গাতেই যাওয়া হয়ে গেছে। দিল্লীর পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াবো আমি, শুধু সেটাই ঠিক করলাম মনে মনে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরে বেড়ালাম সেইমতো প্রায় ঘণ্টা চারেক। ভারতীয়রা আমাদের ব্যাপারে কৌতূহলী খুবই। সেই কারণে আমাদের দেখছিল অনেকেই। একটি রেস্তোরাঁয় বসে লাঞ্চ খেলাম দিল্লীর চাঁদনি চক এলাকায়। আমাদের মত আরো অনেক বিদেশী দেখলাম সেখানে। মার্গারেটকে দেখলাম আমার সঙ্গে কথা বলার চেয়ে ফ্রেডির সঙ্গেই বেশী মনোযোগ দিয়ে কথা বলছে।

আমার দিকে তাকিয়ে খেতে খেতে হেসে বলল ফ্রেডি, তুমি খুবই ভাগ্যবান পিটার ভারতে যদি তুমি না আসতে তাহলে সত্যিই তুমি বঞ্চিত হতে কারণ এরকম একটি ম্যাডোনাকে কাছে পাওয়া সত্যিই খুবই ভাগ্যের ব্যাপার।

আমি কিছু না বলে শুধু মৃদু হাসলাম। মার্গারেটও প্রশংসা শুনে হাসল। মুগ্ধতার আভাস তার চোখ দুটোয়। অনেকটা সেরে উঠেছে এখন ওর শরীর। কমনীয়তা ফিরে এসেছে আবার আগের মত চেহারায়। তার কথাবার্তায় রীতিমতো রসিকতা। ফ্রেডির সঙ্গে মার্গারেটের দৃষ্টি বিনিময় মাঝে মাঝেই হচ্ছিল কথার ফাঁকে। ফ্রেডি মার্গারেটের প্রেমে পড়েছে এটা আমার মনে বেশ ভাল রকম ধারণা হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য একটা ব্যাপার আমি ঠিকমতো বুঝতে পারছি না যে মার্গারেটের আকর্ষণ ওর ওপরে আসে কিনা। বেশ

ছটফটে স্বভাবের নারী মিমি। যেকোনো পুরুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার ওর অসাধারণ ক্ষমতা আছে। যেকোনো পুরুষকে এক নিমেষে উন্মাদ করে দিতে পারে ওর কমনীয় এবং যৌন আবেদনময় চেহারা এবং দুচোখের অসাধারণ অভিব্যক্তি।

ফ্রেডির বুকে এখন তোলপাড় আরম্ভ হয়েছে এটা আমি বুঝতে পারছি বেশ ভালভাবেই। আমার কাছে মোটেই ভাল ঠেকছেনা ব্যাপারটা। হঠাৎ আমাকে বললো ফ্রেডি, পিটার কলকাতায় একটা ভাল চাকরীতে লাগিয়ে দাও মার্গারেটকে।

আমি হেসে বললাম, ইচ্ছা আছে কিন্তু দেখা যাক আমি কতদূর কি করতে পারি।

মার্গারেট বলে উঠল ফ্রেডি কিছু বলার আগেই, আমার খুব ভাল লাগে চাকরী করতে।

হেসে বলল ফ্রেডি, ভাল লাগাই উচিত, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো তাহলে আমি একটা কথা বলব পিটার।

আমি জবাব দিলাম, বলল।

ফ্রেডি বলল, কলকাতায় এবার তো এখান থেকে যাবে তোমরা, সেখানে এক ভাল হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার চেনা আছে। সেখানে হয়ত হতে পারে রিসেপশনিস্টের কাজ।

হাততালি দিয়ে মার্গারেট উৎফুল্ল ভাবে বলে উঠল, সত্যিই খুব মজা হবে তো তাহলে।

আমি সেই মুহূর্তে মার্গারেটের দিকে তাকালাম কারণ আমার খুব ভাল লাগে ওর এই বালিকাসুলভ চপলতা। আমার মনে হয় ও যেন প্রচণ্ড সরল এবং ওর এই সরলতাই আমাকে আকর্ষণ করে প্রচণ্ড। ওকে কিন্তু আমার আজকাল প্রায়ই মনে হয় ও যেন এক রহস্যময়ী নারী। তখন ঠিক বোঝা যায় না ওর ব্যবহারের সঠিক অর্থ কি? ভাল করে মনোবিজ্ঞানটা পড়লে ভাল হত বলে তখন আমার মনে হয়। বিশেষভাবে গবেষণা করা উচিত নারীদের এই মানসিকতার বিষয়টি নিয়ে এবং এটাই ছিল আমার অভিমত।

মার্গারেট ওর সেই স্বভাবজাত চপল কণ্ঠস্বর নিয়ে বলে উঠল, বলো না কবে আমাদের কলকাতায় যাওয়া হবে?

আমি বললাম, যাব এবারই।

ফ্রেডি বলল, ঠিক আছে, কলকাতাতে এখন তো আমি যেতে পারছি না, কারণ আমাকে দিল্লীতে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে তাই আমি একটা চিঠি লিখে দেবো। একটা রেস্তোরাঁর ব্যবস্থা হয়ে যাবে ওখানে তোমরা গেলেই।

রেস্তোরাঁ ছেড়ে আমরা ফিরে এলাম হোটেলে। মার্গারেট এবং ফ্রেডি গল্প করে কাটাল হোটেলে আসবার পথে বেশীরভাগ সময়টাই। ফ্রেডি একবার বলল এবং আমি শুনলাম, যে ও একটা কবিতা লিখবে মার্গারেটকে নিয়ে। মার্গারেট এই কথা শুনে হেসে আকুল হয়ে উঠল এবং তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, জানো তো ফ্রেডি যদি আমাকে নিয়ে একটি কবিতা লেখে তা তুমি তাহলে আমাকে নিয়ে একটি গল্প লিখবে নিশ্চয়।

আমি বললাম হেসে, আমি নেহাৎই ডাক্তার, সাহিত্যিক নই, দেহের ডাক্তার না হয়ে মনের ডাক্তার হলে সবচেয়ে ভাল হত বলে আমার মনে হচ্ছে এখন।

মার্গারেট দুচোখে ঝিলিক দিয়ে বলে উঠল, কেন?

মার্গারেটের দিকে আমি তাকালাম এবং বললাম, খুব আকর্ষণীয় বস্তু হচ্ছে মেয়েদের মন, জানো কি, ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়ে গেছিল এই হেলেনের জন্য। ফ্রেডি তুমি কি বল।

সজোরে হেসে উঠল ফ্রেডি। তারপর বলে উঠল সে, এটা কি সহজ ব্যাপার যে ইংল্যান্ডের অষ্টম এডওয়ার্ড এক সামান্য নারী–ওয়ালিস মিগসনের জন্য রাজ্যপাট ছেড়েছিল! গবেষণার বস্তু রীতিমতো রমনী। ওদের কাছে তো শিশু আমরা। একেবারেই দুগ্ধপোষ্য, মার্গারেট কি বল!

খিলখিল করে হাসল মার্গারেট, তারপর আচমকা বলে উঠল, তুমি যা বলেছ তা ঠিক, নজর সব পুরুষেরই এক থাকে।

কথাটা প্রথমে ধরতে পারেনি ফ্রেডি কিন্তু পরে যখন বুঝল তখন হেসে উঠল হো হো করে এবং রীতিমতো লাল হয়ে উঠল কান দুটো আমার। হাসছিল তখন মার্গারেট। সত্যিই তোমার কোনো তুলনা নেই মার্গারেট, আমি বলে উঠলাম।

ফ্রেডি চলে গেল আরও আধঘণ্টা সময় আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে। রাত্রে ডিনারের আগে যদি সম্ভব হয় আসবে একবার ও চলে গেল একথা বলেই। ঘাড় নাড়লাম আমি। মার্গারেট পোষাক ছেড়ে গাউন পরলো ফ্রেডি চলে যাবার পরই। গলার কাছে কারুকাজ

করা খয়েরী রঙের একটা সাধারণ পোষাকে বারান্দায় এসে বসেছি আমি পোষাক ছেড়ে। আমার মুখোমুখি এসে বসলো মার্গারেট। গলায় সোনার নয় কিন্তু একটি সোনার মতই দেখতে দামী হার যা ওকে কিনে দিয়েছে ফ্রেডি বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে। হারটা খুব অপূর্ব লাগছিল ওর সাদা দুধের মত শরীরে। আমি মার্গারেটের হারটা দেখে ওর বুকের দিকে তাকালাম এবং ঠিক তখনই ও আমাকে বলে উঠল, দুগ্ধপোষ্য শিশু।

ঘাড় নাড়লাম আমি। একটা ক্ষীণ যন্ত্রণা হচ্ছিল আমার ভেতরে। ফ্রেডিকে কি ঈর্ষা করছি আমি তবে। কিরকম যেন রাগ হচ্ছিল আমার মার্গারেটের ওপরে। সমস্ত জায়গা জুড়ে ক্রমশঃ নেমে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার। আমি ভাল ভাবে নিতে পারছি না ফ্রেডির সঙ্গে মিমির এই ঘনিষ্ঠতা। আমি মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে বললাম, দুটো স্ত্রীই ফ্রেডিকে ছেড়ে চলে গেছে। হয়ত সুবিধার নয় ও স্বামী হিসাবে।

মার্গারেট বলল, তুমিই জানো যে তোমার বন্ধু কি রকম। আমি কি করে বলবো যে তোমার বন্ধু কেমন, তবে ওকে আমার ভাল লেগেছে বেশ।

আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, ওকে তুমি সেরকম বেশী আমল দিও না।

ঠোঁট টিপে হেসে মার্গারেট বলল, ঈর্ষা হচ্ছে না কি তোমার বন্ধুর ওপর?

ঈর্ষা হবার কারণ কি, তবে অন্য পুরুষদের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করো সেটা আমি চাইনা। ঠিক। ফ্রেডি পুরুষতো বটেই। যদিও হোক না কেন আমার বন্ধু।

তারপর সামান্য চুপ করে থেকে আবার বলল, যে চিঠিটা ও দেবে সেটা আমি নেব, কারণ ওটা আমার লাগবে যদি আমি কলকাতায় যাই।

আমি বললাম, তুমি কি সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে যে চাকরী করবে?

তুমি তো ওখানে আর সবসময় থাকবে না আমার কাছে। কিছুতে একটা করতেই হবে।

আমি কোনোরকম জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলাম। মার্গারেট আমার প্রিয়তমাকে আমি দেখতে লাগলাম একই ভাবে। আমার দিকে মার্গারেট তাকালো একবার। ওর ভেতরের অন্তর্বাস দেখা যাচ্ছে স্বচ্ছ পাতলা গাউনের ভিতর দিয়ে। একবার আড়মোড়া ভাঙলো ও হাত দুটো উপর দিকে তুলে এবং তারপর হাই তুললল। খুব ক্লান্ত লাগছে, বলে উঠলো।

ওর একটা হাত ধরলাম আমি এবং তখন ও খানিকটা বিরক্ত ভঙ্গীতে বলল, আজকে আমার আর ভাল লাগছে না।

মিমি বুঝতে পেরেছিল যে আমি তাকিয়ে আছি ওর বুকের দিকে, কিন্তু ক্রমশঃ কমে আসছিল আমার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ। মিমি প্লীজ একবার, আমি বলে উঠলাম।

ও বলে উঠল, না। কিছুক্ষণ বাদে উঠে ও ঘরের ভিতর চলে যাবার পর আমি গিয়ে দেখি যে ও ফ্রেডির দেওয়া উপন্যাসটা পড়ছে। আমি গিয়ে ওর হাত থেকে বইটা নিলাম এবং তারপর টেবিলের পাশে রেখে দিয়ে বললাম, শরীর খারাপ বললে যে তুমি?

কঠিন মুখে মার্গারেট বলে উঠলো, কেন তুমি কেড়ে নিলে বইটা, আমি বিছানায় বসে ওর ওপর ঝুঁকে পড়লাম, দু হাত ওর শরীরের দুদিকে রেখে। আমাকে সরিয়ে দিল ঠেলে ও, ওর দুটো হাত দিয়ে এবং ঝাঁঝিয়ে বলল, আমার তোমার সঙ্গে চলে আসাটাই ভুল হয়েছে কারণ সব সময় ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না।

বেশ খানিকটা আহত হলাম আমি এবারে। কিন্তু ঠিক তখনই ওর সঙ্গে কিছুঝগড়াঝাটি করতে আমার মন চাইছে না। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আমার কিছুটা ফিরে এসেছে ওর সেই ধাক্কা খাবার পর। এটা আমি ভাবতেই পারছিলাম না যে ও আমার কাছে আর থাকবে না। আমার চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাবে ওকে দেখতে না পেলে।

জানোয়ার, এবার বলে উঠল মার্গারেট অস্ফুট কণ্ঠে।

বিছানায় গিয়ে আমি বসলাম কিন্তু বেরোচ্ছিল না কিছু মুখ দিয়ে। শুধু একটি কথাই বললাম, মিমি তুমি আমাকে অপমান করলে।

কোনো জবাব না দিয়ে টেবিল থেকে ফ্রেডির লেখা উপন্যাস নিয়ে মিমি পড়তে আরম্ভ করল।

মিসেস হ্যারিসনের প্রেমকাহিনী বইয়ের মলাটের ওপরেই এই লেখাটা জ্বলজ্বল করছে আমার চোখে। একটা দেওয়াল তৈরী করছে ফ্রেডি আমার এবং মার্গারেটের মধ্যিখানে। এটা আমাকে ভাঙতেই হবে তা যে করেই হোক। ডিনার খাওয়া আর হলো না আমার সে রাতে। কেউই খেলাম না, ফ্রেডি আসেনি, সেই কারণে আমরা শুয়ে পড়লাম।

একেবারে সকাল হতে ঘুম ভাঙলো। উঠে বসে, পাশ ফিরে তাকিয়ে মার্গারেটকে দেখলাম। ও ঘুমোচ্ছে অঘোরে এবং বইটা খোলা অবস্থায় উল্টে রেখেছে বুকে। নিষ্পাপ সরল বালিকার মত লাগছে ঘুমন্ত মার্গারেটকে। ভাল করে ওর দিকে তাকিয়ে আমি বইটা ওর বুকের উপর থেকে। তুলে নিয়ে রেখে দিলাম টেবিলের ওপর। একটুও ইচ্ছা করছিল না আমার ভেতরটা দেখতে। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন হেরে গেছি ফ্রেডির কাছে এই জায়গাটায়। গভীর ঘুমে অচেতন মার্গারেট। কিছুটা উঠে গেছে তার গাউনের তলার দিকের অংশ এবং তার ফলে দেখা যাচ্ছে পা দুটোর ডিমের কাছের অংশ। মনে মনে বললাম, প্রিয়তমা মার্গারেট তুমি আমার। আমি ছাড়তে পারবো না তোমাকে কিছুতেই। আমার কাছে সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে যদি তুমি চলে যাও। তুমি কারোর নয় মার্গারেট, আমার, একান্তভাবেই শুধু আমার।

একভাবেই তাকিয়েছিলাম আমি মার্গারেটের দিকে। একটি পাখি অনবরত ডাকছিল গাছের উপর বসে। হঠাৎ চোখ মেলে ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই পবিত্র হাসি দিয়ে ও আমাকে ভুলিয়ে দিল ওর গতরাতের অপমান। ওর জন্যে আমি এই মুহূর্তে করতে পারি সবকিছু।

.

১৮.

বেলা নটা নাগাদ আমি বেরিয়ে পড়লাম ব্রেকফাস্ট করে। বিশেষ দরকার আছে একটা। একটা ট্রাংকল করতে হবে লন্ডনে আমার হোটেলের কর্মচারীকে। বোম্বের হোটেলে

নিশ্চয় আমার কর্মচারী ফোন করেছিল। ওখানে ফোন করা হয়নি অবশ্য এখনও আমার। আমার আসলে ভীষণ দ্বিধা হচ্ছিল বোম্বেতে ট্রাংকল করব না করব না। হ্যারিয়েট আমাদের সন্ধান জানুক এটা আমি কোনমতেই চাইছিলাম না। একটা কাজ অবশ্য আমি ইতিমধ্যে করেছিলাম। হ্যারিয়েটের স্কুলে ট্রাংকল করেছিলাম বোম্বে থেকে চলে আসার ঠিক একমাস পরে। সেদিন স্কুলে আসেনি অবশ্য হ্যারিয়েট। এখানে ফিল্মের কাজে যে আমরা আটকে গেছি তা আমি ট্রাংকলে স্কুলের হেডমিসট্রেসকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। আরো মাসখানেক দেরী হতে পারে, তিনি যেন ব্যাপারটা অবশ্যই জানিয়ে দেন মিসেস হ্যারিয়েট মুরকে। তিনি যেন চিন্তা না করেন অযথা।

অবশ্য জানিয়ে ছিলেন হেডমিসট্রেস যে, খুবই চিন্তিত উনি ওনার মেয়ের জন্য এবং সবসময়ই বলেন ওদের কাছে ওনার মেয়ের কথা।

আমি বলেছিলাম আশ্বাস দিয়ে, এটা ওকে জানিয়ে দেবেন যে চিন্তার কোনো কারণ নেই, ও ভালই আছে আমার কাছে। শেষ হতে একটু সময় লাগবে কারণ ফিল্মে নামার জন্য অনেক রকম ব্যাপার স্যাপার আছে।

আমার প্রথম এবং শেষ ট্রাংকল ছিল সেইটাই। তারপর দীর্ঘকাল আর আমি করিনি। একেবারেই ঝুঁকি নিতে চাই নি হোটেল থেকে ট্রাংকল করবার। হ্যারিয়েট জানুক যে আমরা ঠিক কোথায় আছি সেটা আমি চাই না একেবারেই। আমার হোটেলের ঐ কর্মচারীকে লন্ডনে ট্রাংকল করলাম এবং বললাম যে ও যেন আমার সমস্ত টাকা অবিলম্বে দিল্লীর এই হোটেলের নামেই পাঠিয়ে দেয়। ওকে ঠিকানাটাও দিলাম।

অবশেষে ট্রাংকল করলাম বোম্বের হোটেলে। ভদ্রলোক একটু অবাক হল আমার ফোন পেয়ে। বলল, স্যার কেমন আছেন, চিন্তা করছিলাম আমি আপনার কথাই।

আমি ভাল আছি, মিসেস মুর আমাদের ওখানে কি এসেছিল?

কর্মচারী বলল, স্যার উনিতো ওনার মেয়ের জন্য খুবই চিন্তিত এবং সেই কারণে উনি বেশ কয়েকবার এসেছিলেন ওনার মেয়ের খোঁজে।

আমি জবাব দিলাম, আপনি কিছু ভাববেন না, আবার যদি উনি না আসেন, তাহলে আপনি ওনার বাড়ি গিয়ে বলে দেবেন যে, আমরা ভাল আছি, যেহেতু আমরা ফিল্মের কাজে ব্যস্ত, সেহেতু ফিরতে আমাদের একটু দেরী হবে।

কর্মচারী বললো, আমি বলে দেবো নিশ্চয় স্যার, আপনি এখন কোথায় আছেন বলবেন?

আমার ঠিকানা ওকে বলা যাবেনা কিছুতেই। বললাম নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় আমাদের থাকা হচ্ছে না ফিল্মের জন্য আমরা এখন রয়েছি ফিল্ম ইউনিটের সঙ্গে। শুনুন আমার টাকা আপনি পাঠিয়ে দেবেন লন্ডনের ঠিকানায়। তবে কেউ যদি চায় এখানকার ঠিকানা তাকে কিন্তু কোনো মতে দেবেন না। মিসেস মুর চাইলে তাকেও দেবেন না বুঝেছেন।

এবার একটু ঘাবড়ে গেল কর্মচারীটি। বললো, স্যার ঠিক আছে, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

আমি এবার হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম সব কিছু সেরে। কে জানে কোথা দিয়ে যে কেটে গেল ঘণ্টা চাবেক সময়। হোটেল দুটোকে বিক্রী করে দিতে হবে। মার্গারেটের কথাটা মনে পড়লো হোটেলের সামনাসামনি এসে। কি করছে এখন ও কে জানে। হোটেলে পা রাখতেই কাউন্টারের ম্যানেজার ভদ্রলোক আমাকে ডাকলেন। আমি এগিয়ে যেতেই উনি আমার হাতে একটি চিরকুট ধরিয়ে দিলেন। তাতে লেখা রয়েছে খুলে দেখলাম, পিটার, আমি ফ্রেডির সঙ্গে একটু বেরোচ্ছি ওর অফিসটা দেখতে অনেকক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করার পর বেরোলাম। কিছু ভেবোনা, আমি ফিরে আসব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

ইতি– তোমার প্রিয়তমা মিমি।

আমার মাথা গরম হয়ে গেল চিঠিটা পড়ে। সোজা দোতলায় উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম এবংটুকরো টুকরো করে ফেলে চিঠিটাকে আমি উড়িয়ে দিলাম হাওয়ায়। একটু দেরী হবে, যাবার সময় আমি বলে গেছি মার্গারেটকে। আমাকে না বলে তা সত্ত্বেও চলে গেছে মার্গারেট। আগুন জ্বলে উঠেছে রীতিমতো আমার মাথায়। ব্যাপারটাকে ফয়সালা করতে হবে তা যে করে থোকনা কেন।

আমি বিন্দুমাত্র আর আমল দিতে রাজী নই ফ্রেডিকে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, যে ফ্রেডির উদ্দেশ্যটা কি। ফ্রেডি এবং মার্গারেট উভয়েই বন্ধু। ওর এটা বোঝা উচিত ছিল যে মার্গারেট আমার প্রেমিকা। ঘরে গিয়ে পোশাক বদল করে আমি এরপর বারান্দায় বসলাম। ক্রমশঃ বারান্দার বাইরে সন্ধ্যা নামছিল। আকাশে মেঘ জমেছে দেখলাম এবং এতে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি বসেছিলাম ঘণ্টাখানেক একভাবে, কারণ আমার

রীতিমতো অসহ্য লাগছিল ভেতরটা। আমি বিশ্বাস রাখতে পারছিলাম না আর কোনো নারীর উপরে। কম বয়েসী সুন্দরী এবং ছটফটে স্বভাবের মেয়ে মার্গারেট। এ থেকে পুরুষের কোনো রকম প্রলোভান আসাটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আমার এখন সেক্ষেত্রে দায়িত্ব মার্গারেটকে পুরোপুরি আড়াল করে রাখা। ওর একমাত্র অভিভাবক এখন আমি। মার্গারেটের ফেরার কোনো নাম নেই যদিও দীর্ঘসময় কেটে গেল। আকাশে মেঘ জমছে ক্রমশঃ এবং বৃষ্টি আসতে পারে যেকোনো সময়। আমি রীতিমতো চিন্তায় অস্থির হয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলাম কিছুক্ষণ। ভাল লাগছে না কিছুই। আমি আমার দুচোখে অন্ধকার দেখি মার্গারেট যদি আমার সামনে না থাকে। ফ্রেডির ঘরটা একবার দেখে এলে হয়, হঠাৎ আমার মনে হল আমি দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে একেবারে শেষপ্রান্তে ফ্রেডির ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে, কিন্তু বাইরে তালা। আমি কি–হোল দিয়ে ভেতরটায় উঁকি দিলাম এবং তাতে মনে হল যে ঘর ফাঁকা, তখন আমি ফিরে এলাম কাউন্টারের। আমাকে দেখে মৃদু হাসলো রিসেপশনিস্ট। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, বলতে পারেন মিঃ উইলসন কখন বেরিয়েছেন?

মহিলাটি আবার মৃদু হাসলো। এবং বলল, মিঃ ব্রাউন, আমি ঠিক বলতে পারছি না, কারণ আমি তখন ডিউটিতে ছিলাম না তাই আমাকে ক্ষমা করবেন।

আচ্ছা, এই কথা বলে আমি বাইরে গেলাম এবং এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে ফিরে এলাম। আমি ঠিক ধুমপায়ী নই। তবে চার-পাঁচটার বেশী সিগারেট আমি খাই না দিনে। একটা সিগারেট ধরালাম বারান্দায় গিয়ে। ক্রমশঃ কমে আসছে রাস্তায় লোকজনের চলাচল। মেঘ ঘন হয়ে আসছে আকাশে এবং বৃষ্টি নামতে পারে যে কোনো

সময়ই। একটি ভয় চেপে বসল, আবার মনের মধ্যে একটি সন্দেহ খেলে গেল হঠাৎ। ফ্রেডির সঙ্গে চলে গেছে কি মার্গারেট! কেমন। যেন অসুস্থ লাগছে আমার নিজেকে। সিগারেট খাচ্ছিলাম চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে। পালিয়ে যেতে পারে না আমার কাছ থেকে মার্গারেট। একান্তভাবে নির্ভরশীল ও আমার উপর। আমার এবং মার্গারেটের পরস্পরের পরস্পরকে ছাড়া চলে না। ওকে আমি খুঁজে বেড়াবো পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ও যদি আমাকে ছেড়ে চলে যায়। আমার সারা দেহ জ্বলে উঠল ফ্রেডির কথা মনে পড়া মাত্রই। এই সব লেখক ভীষণ বিপজ্জনক যদিও আমার বন্ধু। এরা রীতিমতো সিদ্ধহস্ত পরের প্রেমিকা কিংবা স্ত্রীকে বাগিয়ে নেবার ব্যাপারে। আমার একসময়ই ঠিক হয়নি ফ্রেডির সঙ্গে মার্গারেটের আলাপ করিয়ে দেওয়াটা। ফ্রেডি সেই জাতেরই পুরুষ যাদের চোখ লক্ করে ওঠে মেয়েমানুষ দেখলেই। কার স্ত্রীর কেচ্ছা কাহিনী নিয়ে এ ইতিহাস লিখেছে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

পরিবেশ ক্রমশঃ নিস্তব্ধ হয়ে আসছে ঝির ঝির বৃষ্টি আরম্ভ হবার পর। শুনতে পাচ্ছিলাম গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়ার শব্দ। বৃষ্টির রেখাগুলি দেখা যাচ্ছে আলোর ভিতর দিয়ে। সময় হয়ে গেল ডিনারের। এরপর হঠাৎ একটি গাড়ির শব্দে আমার চমক ভাঙল। বারান্দায় উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি সঙ্গে সঙ্গে। যা ভেবেছি তাই ঠিক। গাড়িটা এসে থেমেছে ঠিক হোটেলের গেটের সামনে। সেদিকে একভাবে তাকিয়ে থাকার পর, দরজা খোলার শব্দ হল হঠাৎ এবং এক যুবতী তার থেকে নেমে এল। ভাল করে তাকিয়ে দেখি মিমি। আমার মার্গারেট। একটা ছোটো আকারের– ছাতা হাতে। হোটেলের দরজার ভেতরে ঢুকলো মার্গারেট গাড়ি থেকে নেমে। ও তাহলে ফিরে এসেছে, কিন্তু আমি তো পাগল হয়ে গেছি নানারকম চিন্তায়। কিন্তু ফ্রেডিকে তো দেখতে পেলাম না, ও তাহলে কোথায় গেল। নানা প্রশ্ন ভিড় করলো মনের মধ্যে। মার্গারেটের পায়ের শব্দ পেলাম সিঁড়িতে, ও

উপরে উঠে আসছে। একটি খুশীর ভাব উথলে উঠছে ওর চলার ছন্দে। মনের নিছকই কল্পনা এটি, তাই আমি টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ছুটতে ছুটতে এসে মার্গারেট দোতলায় উঠে আমার পিছনে হাত রেখে বলল, তুমি কি রাগ করেছে পিটার?

আমি দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইলাম কিন্তু কোনো কথা বললাম না এবং সেই সময় একটি একটি করে পাতা ঝরে পড়ছিল বাগানের।

মার্গারেট বলল, কি হলো, শোনো লক্ষ্মীটি।

চোখ দুটো জ্বলছিল আমার, আমি ঘুরে দাঁড়ালাম এক ঝটকায়। মার্গারেট ভয় পেয়ে গেল আমার চোখের দিকে তাকিয়ে। আমি কিন্তু বলে....এই কথা বলল সে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে অস্ফুট স্বরে।

সজোরে এক থাপ্পড় কষালাম আমি ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে। ও খানিকটা ঘাবড়ে গেল এই আকস্মিক আঘাতে, জলে ভরে গেল ওর চোখ দুটো, আমায় তুমি মারলে, এই কথা বলল শুধু ও জড়ানো কণ্ঠস্বরে।

ও আর না দাঁড়িয়ে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল ছাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। ঘরে ঢুকলাম আমি ওর পিছন পিছন, তুমি কি যা ইচ্ছা তাই করবে, কি ভেবেছে কি, কথাটা বললাম কঠিন স্বরে ওর সামনে দাঁড়িয়ে।

একই ভাবে কাঁদতে লাগল মার্গারেট কোনো কথার জবাব না দিয়ে। চীৎকার করে বললাম আমি আবার, জবাব দাও কি হলো?

আমি তো জানিয়ে গেছি তোমায়।

জবাব দিল মার্গারেট কাঁদতে কাঁদতে। ওর চুলের মুঠি ধরে আমি ওকে তুলে ধরে বসিয়ে দিয়ে বললাম, কি হয়েছে তাতে, আমি তোমায় বারণ করেছি ওর সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করতে।

এবার আরো জোরে কেঁদে উঠল মার্গারেট। ও রীতিমতো প্রতিবাদ করে অন্য সময়ে, কিন্তু এখন করল না বলে অবাক হয়ে গেলাম। সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না ওর এইরকম আচরণের অর্থ। ছেড়ে দিলাম ওর চুলের মুঠি এবং বললাম, যাও পোষাক ছেড়ে গা ধুয়ে এস এখনও ডিনার হয়নি।

কি হলো যাও–মার্গারেট তখনও, কাঁদছিল তাই ধমকে বললাম। বিছানা ছেড়ে উঠে মার্গারেট গায়ের পোষাক খুলে একটা তোয়ালে জড়িয়ে ঢুকে গেল বাথরুমে। বিছানায় শুয়ে রইলাম আমি চুপচাপ। টেবিলে পড়ে রয়েছে ফ্রেডির লেখা বইটা, আমি উল্টে রাখলাম বই এর মলাটটা কারণ আমার দেখতে ইচ্ছা করছিল না ফ্রেডির নামটা। কেটে গেল প্রায় মিনিট পঁচিশেক। সেই তোয়ালে জড়িয়েই ও বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। ওর দিকে তাকিয়েও আমি ইচ্ছে করে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে মার্গারেট তার প্রিয় পোষাক সেই সাদা রঙের গাউন পরে নিল। এটা চমৎকার মানায় আমার সুন্দরী প্রিয়তমা মার্গারেটের শরীরে। বাইরে আমি গম্ভীর থাকলাম যদিও

ভেতর ভেতর উত্তেজিত বোধ করছি। আমার দিকে তাকালো মার্গারেট বার কয়েক। তারপর খুব আস্তে বলল, হয়ে গেছে আমার।

ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে তাই আমি উঠে দাঁড়ালাম। মার্গারেটের দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, চলো।

বড়োতজার আধঘণ্টা লাগল আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ করতে। আমি আর ও বারান্দার চেয়ারে বসলাম খাওয়া শেষ করে। চুপচাপ এবং বিষণ্ণ মার্গারেট। ফ্রেডি তোমার সঙ্গে আসেনি? আমি জিজ্ঞেস করলাম মার্গারেটকে।

মার্গারেট কোনো জবাব দিলনা, সেই কারণেই আমি বললাম, কি হলো?

মার্গারেট যা বলার তা বললো এবং এরপর দুজনে আমরা চুপচাপ রইলাম।

ফ্রেডি কেমন লোক, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

জানি না, মার্গারেট বলে উঠল।

আমি বললাম, আমি তোমাকে নিষেধ করে দিয়েছিলাম না ওর সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতে।

আর মিশবো না, ও জবাব দিল।

কি হয়েছে তোমার, তুমি এত চুপচাপ কেন? আমার কথার উত্তরে ও কিছু না বলাতে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কি হলো?

মার্গারেট চমকে উঠে কাঁদতে আরম্ভ করলো আবার আমার বুকের ভেতর মুখটা খুঁজে। ও তো ওরকম ধরনের আচরণ করে না, তাই একটু অবাক হয়ে গেলাম আমি। ওকে যেন কিরকম অস্বাভাবিক লাগছে। ওর মাথায় হাত রেখে আমি বললাম, কি হয়েছে তোমার মিমি?

মার্গারেট কাঁদছিল ফুঁপিয়ে। তোমার দুঃখ হয়েছে যেহেতু আমি তোমায় মেরেছি, আমি বললাম।

মার্গারেট ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, কিছুই হয়নি আমার কিছুই হয়নি।

ফ্রেডি কি কিছু বলেছে তোমায়? আমি এবার বললাম। ও জবাব দিল চমকে ওঠে, না।

দুজনে বিশ্রাম নিলাম বেশ কিছুক্ষণ বারান্দায় তার কিছুক্ষণ পর ঘরে গিয়ে মার্গারেট সোজা বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং ফ্রেডির বইটা যে ও ছুঁলোনা সেটাও আমি লক্ষ্য করলাম। ও শুয়ে রইল চুপচাপ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে। ওর মাথার কাছে বসলাম আমি এসে। এবং ওর মাথায় হাত বুলোত লাগলাম পরম আবেগে। চোখ বুজে ছিল মার্গারেট, আমি বললাম, তুমি কিছু মনে করো না মিমি কারণ তখন আমার মাথার কোনো ঠিক ছিল না।

এরপর আমি সরে এলাম ওর কোমরের কাছে এবং ওকে চুমু খেলাম দুহাত ওর দুপাশে রেখে উপুড় হয়ে। উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম ক্রমশঃ আমি এবং ততক্ষণে খুলে দিয়েছি ওর গাউনের উপরকার অংশটি। এবার বলে উঠলো মার্গারেট, না, প্লীজ আজ নয়... ক্রমশঃ আমার সংযম কেড়ে নিচ্ছে, আমি বললাম কেন?

শরীরটা আমার ভাল লাগছে না।

কোথায় গিয়েছিলে তোমরা? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ধীরে ধীরে ও বলল, প্রথমে ফ্রেডির ওখানকার একটি অফিসে এবং তারপর একটি হোটেলে।

ওর বুকের উপর আমি মুখ রেখেছি এবং তার ফলে আমার চেতনা ক্রমশঃ হারাচ্ছে। আমি, আরো নামিয়ে দিলাম ওর গাউনটা। ঝাঁকিয়ে উঠল মার্গারেট, না প্লীজ আজ নয়।

আমি তোমাকে এক্ষুনি চাই, কেন নয় বলছ।

আমি মার্গারেটকে মুক্তি দিলাম এর প্রায় আধঘণ্টা পরে এবং ও পোষাক না পরে ফোঁপাতে লাগলো উপুড় হওয়া অবস্থাতেই, তখন শুনতে পেলাম দেওয়াল ঘড়িতে দুটো বাজার শব্দ।

.

১৯.

আমরা কলকাতায় এসেছি তা মাস দুয়েক হয়ে গেল। এই এলাকাটা মোটামুটি ভাল, আমরা যে এলাকাটায় এসেছি। এখানে থাকে আমাদের স্বদেশীয় অনেক লোক, সাহেবপাড়া বলে জায়গাটাকে এখানকার লোকেরা। আমি একটি বেশ ছিমছাম এবং খোলামেলা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। বাড়িটি দোতলা এবং এর একতলায় একখানা বড় ঘর, যা ড্রয়িং রুম হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং দোতলায় মোটামুটি বড় একটি বেডরুম, যার পাশে রয়েছে ছোটো রান্নাঘর। খানিকটা দূরে রয়েছে বাথরুম। আমাদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে মালিকের বাড়ি। আমাদেরই স্বজাতি ভদ্রলোক। এখানকারই এক মহিলাকে বিয়ে করেছেন। ভদ্রলোক খুব আমুদে স্বভাবের এবং দুখানা ছেলেমেয়ে ওনার। আমার পছন্দ হয়েছে মোটামুটি বাড়িটা এবং মার্গারেটেরও তাই। এবারে ঠিক করেছি এখানে চেম্বার করবো। যদিও হার্ট স্পেশালিস্ট আমি, তথাপি ঠিক করেছি যে সবরকম চিকিৎসাই করব। তবে বেশী বজায় রাখব আমার কাজের মধ্যে মানুষের সেবাটা।

আমার খুব ভাল লাগছে এই শহরটাকে যত দেখছি ততই। এটি দিল্লী কিংবা বোম্বের তুলনায় একেবারেই আলাদা। দেখা হয়ে গেছে অক্টারলোনি মনুমেন্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। দুটোই খুব ভাল লেগেছে। তাজমহলকে মনে রেখে তৈরী করা হয়েছে ভিক্টোরিয়াকে। কুতুবমিনারকে মনে রেখে মনুমেন্ট, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি আমি এবং মার্গারেট। হগ সাহেবের মার্কেট খুব একটা দূরে নয় আমাদের বাড়ি থেকে। সব কিছুই পাওয়া যায় ওখানে, একদিন চিড়িয়াখানা গেলাম ট্রামে করে। মার্গারেট রীতিমতো খুশী ট্রামে চড়ে এবং চিড়িয়াখানা দেখে। কত বড় জায়গা এবং ভাবাই যায় না ওখানেকত পশুপাখি রয়েছে। যা দেখে ও বাচ্চা মেয়ের মত হাততালি দিয়ে উঠেছিল।

বাঘ দেখে এবং বাঘের আওয়াজ শুনে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল ভয়ে। শহরটা যেন অতিমাত্রায় জীবন্ত বলে সব দিক থেকেই আমার মনে হয়েছিল। লোকজনের ভিড় সবসময় সবজায়গায়। তবে আমাদের দেখলে এখানকার বেশীরভাগ লোক তাকিয়ে থাকে ভয় আর কৌতূহল মাখানো দৃষ্টিতে। এখানকার লোকেরাই ভারতের মধ্যে সব থেকে বেশী বুদ্ধিমান এবং সংস্কৃতিবান। রবীন্দ্রনাথ সেই বাঙালী কবি যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন কলকাতারই মানুষ। একদিন জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলাম কবির বাড়ি দেখতে। যদিও জায়গাটা খুব ঘিঞ্জি তথাপি কবির বাড়িটা কিন্তু খুবই ভাল। খুবই শ্রদ্ধা হয় দেখলে। যদিও মার্গারেট এখানকার মেয়ে তথাপি সে জানে না রবীন্দ্রনাথকে।

একটু পাল্টে গেছে মার্গারেট এখানে এসে এবং সে একটু চুপচাপ হয়ে গেছে। আমার ওকে খুব ভাল লাগে যখন মাঝে মাঝে খুশী থাকে ও। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিই এবং আমার কোলে ও চুপচাপ শুয়ে থাকে। এখানে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব আর্ত মানুষের সেবায়, সেটাই ভাবছি। এই কলকাতা জব চার্নকের শহর। আমি বলা যায় ভালবেসে ফেলেছি এই অদ্ভুত শহরকে। একজন মহিলা ডরোথি টেলরকে রেখেছি এই বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম দেখাশুনা করার জন্য। সবে তিরিশ পেরিয়েছে মহিলা, আমার চেয়ে ক বছরের ছোট। ওকে বেশ কম বয়েসী লাগে ওর ছোটো খাট এবং আঁটো সাঁটো চেহারার জন্য। মার্গারেটের তো খুবই ভাল লেগেছে এবং ও আন্টি বলতে অজ্ঞান। ডরোথির মুখ কিন্তু সুন্দর নয় যদিও চেহারাটা মোটামুটি ভালো। দাঁতগুলো উঁচু কিন্তু চোখদুটো আবার মোটামুটি ছোটো এবং ভেতরে ঢোকা। ওর ব্যবহারের দ্বারা ইতিমধ্যেই আমাদের মন জয় করতে পেরেছে। আমি নিশ্চিন্ত ওর হাতে রান্নাবান্না থেকে শুরু করে বাড়ির সব কিছু দায় দায়িত্ব দিয়ে। ডরোথির স্বামী মারা গেছে এবং কেবল একটি মাত্র

ছেলে আছে। শর্টহ্যারল্ড শেখার জন্য মার্গারেটকে এখানে এক ভদ্রমহিলার কাছে ভর্তি করে দিয়েছি। উনি শেখান নিজের বাড়িতেই। এক বিদেশী ফার্মে উনি চাকরী করেন। উনি বাড়িতে ওনার অবসর সময়ে টাইপ এবং শর্টহ্যারল্ড শেখান। গোটা তিনেক টাইপ রাইটার আছে বাড়িতে। আরো কয়েকজন শেখে ওখানে মার্গারেট ছাড়া। ওখানে যায় ও প্রতিদিন বিকালবেলা। নানা ধরনের বই আমি কিনে দিয়েছি মার্গারেটকে এবং আমি এটাই চাই যে ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করুক।

যখন প্রথম দেখেছিলাম মার্গারেটকে তখন একধরনের ছিল ও এবং ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে ও এখন। যদিও ওর ছটফটে এবং জেদী স্বভাবটা এখনো যায়নি। ইদানীং কেমন যেন চুপচাপ হয়ে যায় ও মাঝে মাঝে। বিস্মিতমুখে অনেকক্ষণ ধরে ও মুখ বুজে শুয়ে থাকে। ঝাঁঝিয়ে উঠে ও ওর কাছে আমি গেলে। ওর কাছ থেকে তখন দূরে থাকি আমি খানিকটা ভয় পেয়ে। লক্ষ্য রাখতে ভুলিনা অবশ্য ওর উপর। ওর ওপর যেন ভালভাবে লক্ষ্য রাখে সেটা আমি ডরোথিকে বলেছি। আমার কাছে আরো রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে আজকাল মার্গারেট। একদিন আমি বেরিয়ে গেছিলাম বাইরে একটা দরকারে। বেরিয়েছিলাম ব্রেকফাস্ট সেরেই। বেশ বেলা হয়ে গেল ফিরতে এবং বাড়ি ফিরে দেখি যে ড্রয়িংরুমের দরজাটা আলগা করে ভেজানো। এরপর আস্তে করে ঠেলে ঢুকে দেখলাম যে মার্গারেট বসে রয়েছে একটি চেয়ারে এবং ওর পা দুটো তুলে দিয়েছে সামনের টেবিলের ওপর। ওর শরীরে পোষাক নেই একচিলতে। মনোযোগ দিয়ে পড়ছে একটা বই। ও বইটা লুকোবার চেষ্টা করলে আমাকে দেখেই। কি ব্যাপার ও কি পাগল টাগল হয়ে গেল নাকি, এই ভেবেই আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম।

ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, বসে আছ কেন ওরকম হয়ে, কি ব্যাপার?

খিলখিল করে হেসে উঠল মার্গারেট, পোষাক পরে নাও, আমি বলে উঠলাম।

মার্গারেট আদুরে ভঙ্গীতে উঃ বলে দুটো হাত পেছনে নিয়ে বলে উঠল, এখন উপরে যাও তুমি।

কি বই দেখি ওটা। আমি বললাম এবার। ও লুকোবার চেষ্টা করলো প্রাণপনে। ওর কাছ থেকে আমি এবার বইটা কেড়ে নিলাম জোর করে। ছবির অ্যালবাম একটা, তাতে রয়েছে পুরুষ নারীর যৌনমিলনের কিছু ছবি বিভিন্ন ভঙ্গীতে। উল্টে পাল্টে আমি বইটা দেখে বললাম, পরে নাও পোষাক। গম্ভীর হয়ে মার্গারেট এরপর স্কার্টটা পরে নিল।

ও আমার সঙ্গে ওপরে এলে আমি বললাম, বসো ঐ চেয়ারটায়।

সামনের চেয়ারে বসে ও একভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

খুব স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি, কোথায় পেলে তুমি এই বইটা? মার্গারেট চুপ করে থাকাতে আমি ধমকে বললাম, কোথায় পেলে তুমি এই বইটা আমায় বল?

রেগে গেল মার্গারেট এবার, যদিও সেটা আমার কাছে খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল। ও বলে উঠল, সব কথা কি তোমাকে আমার বলতে হবে, স্বাধীনতা কি আমার একটুও থাকবেনা তোমার জন্য?

কিছুটা অবাক হয়ে গেলাম এবার আমি। এতে এক পরিণত নারীর কণ্ঠস্বর, এতো সেই সরল বালিকা মার্গারেট নয়। খানিকটা দমে গেলাম, মনে মনে বুঝলাম কোনো কিছু

কাজ হবেনা রেগে গেলেও। আমি তখন হেসে বললাম, ঠিক আছে, আমি স্বাধীনতা দিলাম তোমাকে, আমাকে বলা উচিত যদি তুমি মনে কর তবেই বলল। ওর দিকে তাকালাম আমি এই বলে।

মার্গারেট ঝাঁঝিয়ে বলল, এতোক্ষণ তো ধমকাচ্ছিলে, ন্যাকার মত এখন আবার কি হল যে তাকিয়ে আছ।

ওর মাথার চুলে আমি হাত রাখলাম ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে। তুমি অতো রেগে গেছ কেন?

ও আমার মাথার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, আমাকে ছাড়ো, তুমি আমাকে ছোঁবে না।

বেশ খানিকটা আহত হলাম আমি। আমি হাসি ভাব তবু বজায় রাখলাম বাইরে। বললাম, তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাব আমি আজ বিকালে। কিছু কিছু মজার বই কিনে দেবো আমি তোমাকে।

মার্গারেট বললো গম্ভীর হয়ে, আমি এরকম ছবিওলা বই কিনবো।

আমি জানি না ও ধরনের বই কোথায় পাওয়া যায়।

মার্গারেট বলল, ঠিক আছে, আমি জেনে নেব।

ক্ষীণ আশা যেন এবার আমি দেখতে পেলাম, কার কাছ থেকে জানবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার এক বান্ধবীর বয়ফ্রেন্ড দিয়েছে ওকে, আমি নিয়ে আসবো তার কাছ থেকে।

এবার বুঝতে পারলাম আমি মার্গারেট যেখানে শর্টহ্যারল্ড শিখতে যায়, সেখানকারই কোনো বান্ধবী হয়ত দিয়েছে ওকে বইটা, তুমি বইটা ওকে ফিরত দিয়ে দাও, আমি বললাম।

আমার সামনে বইটা এগিয়ে ধরে মার্গারেট আমাকে দেখালো যৌন মিলনের একটি বিশেষ অস্বাভাবিক ছবি এবং দেখানোর পরই ও হাসতে লাগল খিলখিল করে।

ওর দিকে গম্ভীর মুখে আমি আবার তাকালাম। আমি সজোরে হেসে উঠলাম যদিও তাতে ও খানিকটা ঘাবড়ে গেল। ওকে কাছে টেনে নিয়ে আমি ওর দুচোখে, ঠোঁটে, গালে, উন্মত্তের মতো চুমু খেলাম। ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠল মার্গারেট। ওর বুকে আমার একটা হাত রাখলাম। আমার বুকের উপরও মার্গারেটের একটা হাত। ওর খেলার বস্তু আমার বুকের চুলগুলো। আমার কিছু টাকার দরকার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন?

ও জবাব দিল, আমার খুব লজ্জা লাগে কারণ আমার বন্ধু বান্ধবীরা রোজ আমাকে খাওয়ায় অথচ আমি ওদের কিছু কোনোদিন খাওয়াতে পারিনা।

আদর করতে করতে আমি ওকে বললাম, ঠিক আছে, তুমি তোমার সব বন্ধুবান্ধবীদের একদিন আমার এখানে নিয়ে এস।

মার্গারেট বলল, আমি আনব ঠিক কথা কিন্তু আমাকে তুমি কিছু টাকা দাও।

আমি বললাম, তাহলে টাকার আবার কি দরকার?

মার্গারেট একটু অভিমান প্রকাশ করে বলল, কেন আমার বুঝি কোনো কারণে টাকার দরকার থাকতে পারে না।

ঠিক আছে দেওয়া যাবে।

আমি ওকে টাকা দিইনি যদিও বলেছিলাম দেব। আমার পকেট থেকে দিন সাতেক পর বেশ কিছু টাকা কমে গেল। আমি প্রচণ্ড বিশ্বাস করি ডরোথিকে। এটা অসম্ভব যে ও আমার টাকা নেবে। আমি ওকে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। বিশ্বাস করা যায় ওকে পরিপূর্ণ ভাবেই। ডাকলাম আমি মার্গারেটকে। ও তখন গল্প করছিল ডরোথির সঙ্গে রান্নাঘরে। খবরের কাগজ পড়ছিলাম আমি চেয়ারে বসে। আমার সামনে মার্গারেট এসে দাঁড়ালো, আমি ওকে বসতে বললাম। চুপচাপ কাটলো কিছুক্ষণ। নিজেই অধৈর্য হয়ে একসময় বলল মার্গারেট, ডাকছো কেন, কি ব্যাপার?

শান্ত ভাবে আমি বললাম, কিছু টাকা আমার পকেটে কম হচ্ছে।

আমার দিকে তাকিয়ে তারপর মার্গারেট বললো, আমি নিয়েছি টাকা।

গম্ভীর হয়ে এবার আমি বললাম, টাকাটা তোমার নেওয়া উচিত হয়নি আমাকে না বলে।

তুমি দাও নি তত আমাকে আমি যখন তোমার কাছে চেয়েছিলাম।

বললাম, হয়তো আমি ভুলে গেছিলাম, কিন্তু তুমি তো আবার চাইলে পারতে।

এবার ঝাঁঝিয়ে বলল মার্গারেট, তোমার কোনো কথা সত্যি নয়, তাছাড়া আমি কি ভিখারী নাকি যে তোমার কাছে বারবার দয়া ভিক্ষা করব।

আমি তোমার অভিভাবক, আমি দয়া ভিক্ষা করতে বলিনি তোমাকে কিন্তু তোমার উচিত হয়নি আমার অনুমতি না নিয়ে নেওয়া।

বেশ রুক্ষ্ম ভাবে আমার দিকে তাকালো সে। তারপর বলল, তুমি আমার অভিভাবকও নও, কেউ নও, তুমি পালিয়ে এসেছ আমাকে নিয়ে মিথ্যা কথা বলে এবং তুমি বেইমানী করেছ আমার মায়ের সঙ্গে তুমি..

এই কথা এক নিঃশ্বাসে বলে ও বইটা আমার দিকে ছুঁড়ে মারতে মাথা নামিয়ে নিলাম আমি। একেবারে মেঝের কোণে পড়ল বইটা চেয়ার ছাড়িয়ে। ও হাঁপাচ্ছিল এবং চোখ দুটো জ্বলছিল ওর। ও খানিকক্ষণ থেকে চলে গেল রান্নাঘরে যেখানে রান্না করছে ডরোথি। ও কথা বললো না আমার সঙ্গে এবং চুপচাপ বসে রইলাম আমি। কিছুতেই আমাকে সহ্য করতে পারছে না মার্গারেট ইদানীং। কিছুদিন ও ভাল থাকে, হাসিখুশি থাকে, আবার অগ্নিশর্মা হয়ে আজেবাজে কথা বলে। ওর গায়ে হাত দিতে সাহস পাই না আমি। আমার মনেরীতিমতো উৎকণ্ঠা যদি কোনো বাজে কাণ্ড করে বসে। ক্রমশঃ দিন

দিন মার্গারেট অবাধ্য হয়ে উঠছে আমার। চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে ছিলাম হঠাৎ একসময় কানে এল হাসির শব্দ। প্রথমটা বুঝতে না পেরে কান খাড়া করতে পরে বুঝতে পারলাম ভালভাবে। খিলখিল হাসি শুনে এবার রীতিমতো অবাক হবার পালা। যে কিনা.ওইরকম ব্যবহার করে গেল সে কি করে আবার হাসতে পারে সরল বালিকার মত। তা কি ভাবা যায়। আওয়াজ শুনলাম ডরোথির গলা, তোমার কথাই বলছিল ভিক্টর।

ডরোথির একমাত্র ছেলে উনিশ কুড়ি বছর বয়সের ভিক্টর। মুখ সুন্দর না হলেও ওর চেহারা বেশ ভাল। পড়াশুনা করে, আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। বছরখানেক বাকি আর গ্র্যাজুয়েট হতে। খুব হাসিখুশী স্বভাবের। বুঝতে পারছি আলাপ হয়েছে মার্গারেটের সঙ্গে। তবে আমার ভয় এবং আশঙ্কা ভিক্টরকে নিয়ে নয় মার্গারেটকে নিয়ে এবং আমার বুক কেঁপে উঠল সেই আশঙ্কাতেই।

ভিক্টরের সঙ্গে গল্প

২০.

একদিন আমি বাড়ি ফিরে দেখি মার্গারেট ড্রয়িংরুমে বসে ভিক্টরের সঙ্গে গল্প করছে। ওর পরনে খানিকটা নীলচে ধরনের রঙীন স্কার্ট, ওকে অনেক কমবয়েসী লাগে ও যখন এটা পরে। চেয়ারের উপর বসে যথারীতি মার্গারেট পা তুলে দিয়েছে টেবিলের উপর এবং তার ফলে ওর প্যান্টিটার খানিকটা দেখা যাচ্ছে স্কার্টের কিছুটা অংশ নেমে গিয়ে। যেকোনো পুরুষের কাছে পরম লোভনীয় ওর এই ফর্সা মাখনের মত নিটোল উরু দুটো। ভিক্টর পরেছে একটি সাদা শার্ট এবং প্যান্ট। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে ছেলেটি স্মার্ট এবং সুন্দর। ভিক্টর কিছুটা কুণ্ঠিত ভাবে উঠে দাঁড়াল আমাকে দেখামাত্রই। অপরাধী ভাব নিয়ে হেসে কোনো রকমে বলল আমাকে, আপনি কেমন আছেন আংকল?

আমাকে আংকল বলতে ওকে শিখিয়ে দিয়েছে ডরোথি। এই চলছে মোটামুটি, আমি জবাব দিলাম।

এরপর চোখ দুটো বড়ো করে ঝাঁঝিয়ে আমি মার্গারেটকে বললাম, একি অসভ্যতা হচ্ছে মার্গারেট, একজন লোক বসে রয়েছে তোমার সামনে, ছিঃ আর তুমি কিনা পা তুলে দিয়েছ টেবিলের উপর, শিগগির নামাও।

তেমন আমল দিল না মার্গারেট আমার কথাটায়। খিল খিল করে হেসে উঠে পা নামালো অনেক অনিচ্ছা নিয়ে। কিন্তু ওকে আর বললাম না আমি। তাকালাম ভিক্টরের দিকে এবং ওকে, বললাম, কেমন চলছে তোমার পড়াশুনা ভিক্টর?

ভিক্টর নীচু গলায় জবাব দিল, এই একরকম।

ড্রয়িং রুমে রাখা একটি ছোটো আকারের খাটের উপর গিয়ে আমি বসলাম।

মার্গারেট হঠাৎ আমাকে আংকল সম্বোধন করে বলে উঠল, ভিক্টরের কাছে বাংলা শিখব আমি।

আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম মার্গারেট আমাকে আংকল বলে সম্বোধন করায়, তবে এটা বুঝতে পারলাম যে ও আমার সঙ্গে রসিকতা করছে। মার্গারেটের দিকে আমি তাকালাম। ওর রসিকতা আমার পছন্দ হচ্ছে না এটা আমি ওকে বুঝিয়ে দিতে চাইলাম আমার চোখের ভাষা দিয়ে।

আমি বাংলা শিখবো, মার্গারেট আবার বলল। এবার আর ও আমাকে আংকল বললো না যে, সেটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। আমি ভিক্টরকে বললাম ওর দিকে নিস্পৃহ ভাবে তাকিয়ে, তুমি বাংলা ভাল জানো বুঝি।

আমি এখানে জন্মেছি, বড় হয়েছি, এমনকি আমার মোটামুটি অনেক বাঙালীবন্ধুবান্ধব আছে। সেই কারণেই আমি কিছু কিছু জানি।

আমি বললাম, মানুষ হিসাবে বাঙালীরা খুব অতিথিপরায়ন হয়।

ভিক্টর বলল, ওদের মধ্যে কিন্তু সংগ্রামী মনোভাবটা অনেক কম থাকে। ওদের মধ্যে পুরনো সংস্কার অনেক থাকে কিন্তু কোনোরকম উচ্চাশা থাকে না। একটু থেমে ও আবার বলল, তবে কি খুব বুদ্ধিমান হয় ওরা, বেশ কিছু পরিচিত বাঙালী আমার আছে।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম বেশ খানিকটা সময় গল্প করে কাটিয়ে দিয়ে।

ভিক্টরের সঙ্গে গল্প করতে লাগলো মার্গারেট। ঠিক ভাবে নিতে পারলাম না আমি ব্যাপারটাকে। আমি মার্গারেটকে ভালবাসি এটা ঠিক কথা কিন্তু আমি ওকে বিশ্বাস করতে পারি না। ওর ঐ জেদী এবং ছটফটে স্বভাব নিয়ে ও কখন যে কি করে বসে তার কোনো ঠিক নেই আমি এখনো ভুলিনি ফ্রেডির সঙ্গে ওর মাখামাখির ব্যাপারটা। সেই রাতে বিশেষ করে মার্গারেটের আচরণ আমি ভুলতে পারব না। কোনো রকম তেজ ওর ছিলনা, ও প্রতিবাদ করেনি কোনে উত্তেজিত আচরণের এবং ওর মধ্যে ছিল কিরকম একটা অপরাধী ভাব। স্বাভাবিক ব্যবহার ফ্রেডি ওর সঙ্গে করেনি এটাই আমার ধারণা ছিল। আমি ব্যাপারটা মার্গারেটের কাছে বারবার জানবার চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুতেই জানতে পারছি না। মার্গারেট যেন ওর প্রসঙ্গ ভুলতে পারলেই বাঁ বলে বারবার মনে হয়েছে আমার। আমাকে বারবার এখন জ্বালাতন করে তোলে সেই ব্যাপারটা ভিক্টরের সঙ্গে এখন ও আবার বেশী মেলামেশা করছে। ওদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক এখ রয়েছে ঠিকই কিন্তু এটা যে চলে যাবে না তারই বা গ্যারান্টি কোথায় রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি না মিমিকে। মিমির তুলনা হয় না পুরুষকে উত্তেজিত করার ব্যাপারে। ওকে কোনদিনই ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না ও যদি একবার অভ্যস্ত হয়ে যায় এই ধরনের

জীবনে। ওকে হারিয়ে যেতে হবে চিরদিনের মত এখানকার এই কুৎসিত ভিড়ের মধ্যে। বেশ্যার জীবন বেছে নিতে হবে যেখানে কিছু নেই নরক ছাড়া। বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে বিছানায় শোওয়া এবং আকণ্ঠ মদ। আমি দেখেছি এদের এখানকারই বিভিন্ন অলিগলিতে এবং শিউরে উঠেছি, ভয়ানক এদের জীবন দেখে মৃত্যুর পর যে জায়গাকে ভারতীয়রা নরকের সঙ্গে তুলনা করে এটা ঠিক সেই ধরনের ভয়ানক বেশ্যাদের জীবনকে এরকম নরক বলে আমার মনে হয় বলেই আমি ঠেলে দিতে পারি না এই জীবনে আমার প্রিয়তমাকে।

আমি ভালবেসেছি মার্গারেটকে। হয়তো অসমবয়সী আমরা কিন্তু এতে ফাঁক নেই। আমি ওকে আন্তরিক ভাবেই ভালবাসি। আমার ভালবাসায় কোনো প্রতারণা নেই। আমার কাছে সেট প্রচণ্ড আঘাত হবে ও যদি আমার কাছ থেকে সরে যায়। আমি হয়তো সহ্য করতে পারবো ন এই আঘাত। আমি জীবনে শান্তি পাইনি কোনদিন নারীর সান্নিধ্যে। আমার জীবনে এমনকি মার্গারেটকে নিয়েও কোনো শান্তি নেই।

মার্গারেট দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিল, আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর। দরজার সামনে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, আমি কিন্তু চলে গেলাম না। একটু শোনা দরকার কি ধরনের কথাবার্ত ওরা বলে। আমার কানে এল মার্গারেটের খিলখিল হাসির শব্দ। মার্গারেট বলছে শুনতে পেলাম তুমি ভিক্টর আমার কান ধরবে না, খুব বেড়ে গেছে তোমার সাহস।

ভিক্টর বললো, তোমার আংকল তোমাকে বারণ করে গেল টেবিলের ওপর পা তুলে বসতে অথচ তুমি।

রাখোতো, বেশ করেছি, টেবিলের ওপর পা রেখেছি, যদি তুমি বেশী কর তো তাহলে আ্রি আমার পোকই খুলে ফেলব।

ভিক্টর বলল, তোমার লজ্জা করবে না, সেকি কথা।

পুরুষরা তোমরা সব কিছু পারো, আর আমরা করতে পারি না। মার্গারেট আবার বলল এক থেমে, শেখাবে তো তুমি আমাকে?

ভিক্টর বললো, আমি তোমায় শেখাবো যদি তোমার আংকল, অনুমতি দেয়।

আরে দুর, আমি খোঁড়াই কেয়ার করি ওসব আংকল টাংকলকে, অনুমতি কিসের। আ কারো আপত্তি শুনবো না, আমি যখন শিখতে ইচ্ছা করেছি তখন আমি শিখবই।

আমি কথাবার্তাগুলো শুনছিলাম কান লাগিয়ে কপাটে। এসব কথা শুনে শিউরে উঠলাম ম মনে, মার্গারেট এসব কথা কি বলছে। কান রাখলাম কপাটে খুব সাবধানে। কানে এলে ভিক্টরে কণ্ঠস্বর, খুব ভালবাসে তোমার আংকল, তোমাকে তাই না!

মার্গারেট বলল, আংকল আংকল করো নাতো বারবার। আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন মি পিটার ব্রাউন এবং কোনো ফাঁক নেই সেই ভালবাসায়, তবে তিনি একটু ঈর্ষান্বিত যৌন ব্যাপারে উনি রীতিমতো ক্ষেপে যান আমাকে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মিশতে দেখলে। আমি এই ৫ কথা বলছি তোমার সঙ্গে তো গিয়ে দেখবো যে উনি গম্ভীর মুখে শুয়ে রয়েছেন বা বসে রয়েছে তেমন ভাবেই কথা বলবেন না উনি আমার সঙ্গে।

ভিক্টর বললো, আমিতো ওটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, তুমি যে কি যৌন ব্যাপারের কথা বললে?

মার্গারেট খিল খিল করে হেসে বলল, তুমি বুঝতে পারবে না ওসব ব্যাপার, আই লাভ ইউ, আচ্ছা ভিক্টর এর বাংলাটা কি হবে।

মোটামুটি থেমে থেমে যে বাংলা উচ্চারণ আমার ওর কানে এল তা হল, আমি তোমাকে। ভালবাসি।

মার্গারেট থেমে থেমে কোনোরকমে উচ্চারণ করল কথাটা এবং সেটাও আমার ঠিক বোধগম্য হল না, এবং তারপর হেসে উঠল সজোরে।

খানিকটা সময় কেটে যাবার পর আমি বুঝলাম যে এখানে থাকাটা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নয় যখন তখনই ওরা বেরিয়ে পড়তে পারে, তাই শোবার ঘরে চলে এলাম আমি চুপি চুপি সিঁড়ি বেয়ে। বিছানায় পোষাক ছেড়ে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে ভাবলাম এবার চোখে চোখে রাখতে হবে মার্গারেটকে। অতো মেলামেশা বন্ধ করতে হবে ওর ভিক্টরের সঙ্গে। এটা মোটেই ভাল নয় যে ওরা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। আমাকে একদিন নিশ্চয় মাশুল গুনতে হবে এরকমভাবে চলতে থাকলে। তুলকালাম করে ছাড়বে যদি মার্গারেট এটা আঁচ করতে পারে। এবং তাতে হবে হিতে বিপরীত। এখন এখানে একটু আসা যাওয়া বাড়িয়েও দিয়েছে ভিক্টর। ওদের আলাপটা যে এর মধ্যেই বেশ পুরনো হয়ে গেছে তা মনে হল ওদের কথাবার্তা শুনেই। আমার আয়ত্তের

বাইরে পুরো পরিস্থিতি চলে যাবে যদি এখন থেকে রশি টেনে না ধরা হয়। আর কোনো উপায় থাকবে না তখন।

আমার ঘরে এলো একবার ডরোথি। লাঞ্চের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, খেয়ে নিন এবার সে বলল।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, বলেছে মিমিকে।

ডরোথি এগিয়ে গেল দরজার দিকে এবং বলল, না এখনো ওকে বলা হয়নি, আগে আপনাকে বলে তবে নীচে গিয়ে ওকে বলবো। আমি আবার ডাকতে ও ঘুরে দাঁড়ালো এবং বললো মৃদু হেসে, আমাকে কিছু বলবেন।

চুপ করে রইলাম আমি কিছুক্ষণ। তারপর বললাম, ঠিক আছে, আমি এখনি খেতে যাচ্ছি তুমি যাও।

প্রথমে ভেবেছিলাম ওকে কিছু বলব ভিক্টরের ব্যাপারে কিন্তু পরে ভাবলাম যে সেটা এখন না বলাই ভাল, মার্গারেটের কানে যদি ব্যাপারটা চলে যায় তাহলে সেটা খুবই খারাপ হবে। খুবই সুচতুর ভাবে বন্ধ করতে হবে ওদের এখনকার মেলামেশা। কোন উপায় নেই এছাড়া। এখন কোনো কাজে জোর করে লাভ নেই তার চেয়ে যদি বুদ্ধিবলে করা যায় তো তাহলে সেটাই খুব ভাল কাজ হবে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ডরোথি।

আমি বাইরে তাকালাম জানালা দিয়ে। গাড়ি চলছে দুরে। মোটামুটি রাস্তার ওপরে এই বাড়ি। কিছুক্ষণ কাটার পরে কানে এলো মার্গারেটের চীৎকার, লাঞ্চ রেডি।

বারান্দায় গেলাম আমি। আমাদের খাবার জায়গা রান্নাঘরের ঠিক সামনের বারান্দাতে। জায়গাটা খুবই চওড়া এবং টেবিলটা ডিম্বাকৃতি। চেয়ার রয়েছে তার চারপাশে, ওর পাশে আমি বসলাম। ডরোথি খায় আমাদের খাবার পরেই। ভিক্টরনীচে ড্রয়িংরুমে বসে আছে, সেটা জানলাম আমি ওকে জিজ্ঞেস করে। ও খাবে ওর মায়ের সঙ্গে বসে। এরপর আরম্ভ করলাম আমরা খেতে এবং আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডরোথি। কারণ ওই আমাদের খাবার পরিবেশন করে।

আমি আবার দোতলায় চলে এলাম নিজের ঘরে খাওয়া শেষ করে। ঘরে এসে ঢুকলো। মার্গারেট মিনিট পাঁচেক পরে। আমি খবরের কাগজ পড়ছিলাম। জোর হাওয়া উঠেছে বৃটেনে, শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসছে নির্বাচনে রক্ষণশীলদের হারিয়ে দিয়ে। আমি যুক্ত নই ব্যক্তিগত ভাবে রাজনীতির সঙ্গে। তেমন একটা বুঝি না এসব ব্যাপারে। আমি রুশ বিপ্লবের বছর উনিশশো সতেরো সালে জন্মেছি। আমার মোটেই তেমন কোনো উৎসাহ নেই সামন্ত্রতন্ত্র সম্পর্কে। আমি কোনো তফাৎ খুঁজে পাই না হিটলার এবং স্তালিনের মধ্যে। আমি যে রাজনীতি বুঝি না সেটা আমি অবশ্য আগেই বলেছি। মার্গারেট এগিয়ে এল আমার কাছে। ওর পরনে নীল রঙের গাউন স্বচ্ছ প্রকৃতির। যদিও ভেতরে অন্তর্বাস রয়েছে তথাপি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বুকের উপরের অংশটা। আমি আধ শোওয়া হয়েছিলাম বিছানায় একটা বালিশে হেলান দিয়ে। ঠিক আমার কোলের কাছটায় এসে মার্গারেট বললো, আমার শরীরটা আজকাল ভাল যাচ্ছে না, কি ব্যাপার বলতো?

আমি বললাম, কি সমস্যা তোমার?

মার্গারেট জবাব দিল, একটুতেই হাঁফিয়ে যাচ্ছি আজকাল, একটুও রুচি নেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে।

ওর দিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম যে একটি মৃদু ক্লান্তির রেখা ওর মুখের মধ্যে। আমার চিন্তা হলো, আমি এখানে এসেছি মাস দুয়েক হলো। আমি এখানকার একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে দিয়ে ওকে দেখাব বলে ঠিক করলাম যদিও আমি নিজে ডাক্তার।

কাছে টেনে নিয়ে মার্গারেটের ঠোঁটে চুমু খেলাম একটা, আলতো করে।

.

২১.

একটা চিন্তা আমার মাথায় সবসময় ঘুরছে যে এখানে একটা চেম্বার করব। যদিও ঠিক করেছি এখানেই প্র্যাকটিশকরবো তবে এখনো ঠিকমতো জায়গা পছন্দ হয়নি। দু-একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে এখানকার এবং তাদেরকেও বলেছি একটি ঘরের সন্ধান দিতে পছন্দমত। ভাবছি এখানে নিয়মিত প্র্যাকটিশ করবো। এখানে আসার পর মার্গারেট বেশ কিছুদিন মনমরা হয়েছিল। আগেকার মত ছটফটে উচ্ছল হয়েছে আবার ও এখন। আলাদা একটা জৌলুস এসেছে ওর চেহারায় এখন, যা দেখলে মাথা ঘুরে যাবে যেকোনো পুরুষের। ভিক্টরের সঙ্গে ও একটু বেশী মেলামেশা করছে বলে আমি ইদানীং লক্ষ্য করছি। অনেকবারই লক্ষ্য করেছি দুজনে বসে চুপচাপ গল্প করছে। হয়ত

আমাকে দেখে হাসল কিন্তু আবার গল্পে মেতে গেল ভিক্টরের সঙ্গে। ওদের এই মেলামেশায় বাধা দেকনা বলেই আপাতত আমি ঠিক করেছি। যদি আমি বাধা দিতে যাই তো মার্গারেট আবার যে স্বভাবের মেয়ে তাতে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা বেশী। তীক্ষ্ণ নজর রেখেছি তবে আমি ওদের ওপর। ওর সঙ্গে অবশ্য এখনও পর্যন্ত মার্গারেটকে আমি কোনো আপত্তিকর অবস্থায় দেখিনি। ভিক্টর খুবই নরম প্রকৃতির এবং ভীতু স্বভাবের যুবক। যেহেতু ওর মা এখানকার পরিচারিককা সেহেতু ও সাহস পাবেনা বেশীদূর এগোতে। একটু সাবধানতা অবশ্য দরকার যেহেতু বিশ্বাস করা যায় না মানুষের মনকে। মার্গারেট যেখানে শর্টহ্যারল্ড শিখছে সেখানে গেলে একবার কেমন হয় বলে আমার মনে হল। যেই মাত্র ভাবলাম, তৎক্ষণাৎ আর দেরী না করে সেখানে গেলাম। বেশ ছিমছাম বাড়ি, পলেস্তারা খসে পড়েছে এখানে ওখানে। চারদিক ভাল করে দেখলাম বাড়িতে ঢোকবার আগে। উল্লেখযোগ্য জিনিষ কিছুই চোখে পড়ল না। আমাদের ওখানকার বাড়িগুলোর সঙ্গে এই বাড়িগুলোর অনেক মিল রয়েছে। দরজায় শব্দ করতে একটি বছর বারো তেরা বয়সের মেয়ে মিনিট পাঁচেক পরে দরজা খুলে দিল। কাকে চাই? ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল আমাকে দেখেই।

মিসেস উইলসন আছেন? বললাম আমি।

মেয়েটা বলল, ওনার আসার সময় হয়ে গেছে তবে উনি এখনও ফেরেননি।

পাঁচটা বেজেছে আমার রিষ্টওয়াচটায় দেখলাম। মেয়েটা বলল, এক্ষুনি ফিরবেন উনি, আসুন ভিতরে আসুন।

বেশ সাজানো গোছানো ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলাম। যীশু খ্রীষ্টের ছবি রয়েছে দেওয়ালে। একটি পুরনো ক্যালেন্ডার টাঙানো চলতি বছরের। একটি মেয়েলী পত্রিকা টেবিলে রয়েছে। সাজানো রয়েছে কিছু বইও। মিসেস উইলসন এলেন প্রায় মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর। উনি হাসলেন আমাকে দেখে। তারপর বললেন, আমার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন আপনি নিশ্চয়।

কিছুক্ষণ আগে এসেছি আমি।

ক্ষমা করবেন আমি আসছি এক মিনিট, এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং পোষাক পরিবর্তন করে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে হাসি মুখে বললেন, কি খবর বলুন?

ওকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি রকম শিখেছে মার্গারেট?

ইতিমধ্যে চা দিয়ে গেছে মেয়েটি? মিসেস উইলসন চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে উঠলেন, খুব ভালই শিখেছে মার্গারেট, বেশ ভাল মাথাটা, তবে...। এই বলে সামান্য থামলেন তিনি এবং ওর কৌতূহলী চোখ নিয়ে আবার বললেন, আপনার ভাইঝিটি খুব চাপা প্রকৃতির।

মনে মনে অবাক হলাম কারণ এই ব্যাপারটা তার উল্টো, এবং খুব কমই আছে ওর মতো হৈ-চৈ এবং খোলামেলা স্বভাবের মেয়ে। জিজ্ঞেস করলাম কারোর সঙ্গে কথা বলে না ও কি এখানে।

হ্যাঁ কথা সবার সঙ্গেই বলে, তবে কেউ যদি ওর বাবার বা মায়ের কথা জিজ্ঞেস করে তখন কিন্তু ও কিছু বলে না। শুধু বলে যে মারা গেছে এবং কেউ যদি আপনার প্রসঙ্গ তোলে তাহলে এড়িয়ে যায় ও একেবারে। আবার বললেন একটু থেমে, ওর কি কোনো পরিচিত ব্যক্তি আছে ফ্রেডি উইলসন বলে।

চমকে উঠলাম আমি। হেসে বললেন মিসেস উইলসন, মার্গারেট আমার পদবী শুনে বলল ওরও একজন এই পদবির ফ্রেডি নামে বন্ধু আছে। ভদ্রলোক নাকি খুব ভাল সাহিত্যিক এবং ভদ্রলোকের খুব প্রশংসাও করল ও।

টিনটিন করলো আমার ভেতরটা। এখনো তাহলে ফ্রেডিকে ভোলেনি মার্গারেট। আমি নিস্পৃহভাবে বললাম, কিছু বলেছে নাকি সে আর ফ্রেডির ব্যাপারে।

তেমন কিছু আর বলেনি, তবে একটা বই ও পড়তে দেবে বলেছে, একটা ফোটোও আমাকে দেখিয়েছে ফ্রেডির এবং এখানে আসারও নাকি কথা আছে ফ্রেডির।

আমি ঘাড় নাড়লাম এবং আমার বুকের ভেতর থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

মিসেস উইলসন বললেন, ওর একটা বিয়ের প্রয়োজন এবং এমন একটা পুরুষের সঙ্গ দরকার যাকে ও ভালবাসে বলে এই মুহূর্তে আমার মনে হয়।

আমি ম্লান হেসে বললাম, আমি ওকে খুব ভালবাসি ছেলেবেলা থেকে এবং এই মুহূর্তে আমি ওর বিয়ের কথা ভাবছি না কারণ আমি ভাবতেই পারছি না যে ও আমার কাছে থাকবে না।

আমার কাঁধে একটা হাত রাখলেন মিসেস উইলসন। তারপর বললেন সহানুভূতির সুরে, আমি বুঝতে পারছি সেটা মিস্টার ব্রাউন, ছেলেবেলা থেকে আপনি মানুষ করেছেন বাপ-মা মরা মেয়েটাকে। ছাড়তে কষ্ট হলেও আপনাকে তো একদিন না একদিন ছাড়তেই হবে এবং চিরকাল তো আপনি আপনার কাছে ওকে ধরে রাখতে পারবেন না।

আমি জবাব দিলাম ম্লান কণ্ঠে, আমার কাছে ওকে রেখে দেবো বলেই তো শিখতে পাঠিয়েছি আপনার কাছে, একটু নজর দেবেন যাতে ও ভালভাবে শেখে। আমি আমার ডাক্তারখানাতেই ভাবছি যে ওকে চাকরীতে লাগিয়ে দেবো। ওকে দিয়েই করাবো আমি আমার সমস্ত কাজকর্ম।

সজোরে হেসে উঠলেন মিসেস উইলসন আমার কথা শুনে, বললেন, অবাক করলেন আপনি আমাকে, যতই আপনি ওকে আপনার নিজের কাছে রাখুন আপনি কি পারকেন ওর মনের ইচ্ছাকে দমন করতে, চাকরী করতেও কী রাজী আছে মার্গারেট? ,

আমি ঘাড় নাড়লাম, হ্যাঁ।

আমি উঠলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা বলার পর। আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন মিসেস উইলসন। আমি নিজের মনেই বেশ ভারী মন নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম। ব্যাপারটা এমনিতে স্বাভাবিক যে মার্গারেট ঐ ভদ্রমহিলার কাছে প্রশংসা করেছে ফ্রেডির। আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না এই ব্যাপারটা। কোথায় যেন খোঁচার মতো বিধছে একটা কাটা। আমাকে কি তাহলে একেবারেই ভালবাসে না মার্গারেট? কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ও আমাকে ভালবাসে এবং এটা আমার মনে হয়

ওর আচার আচরণ দেখে। কেন রয়েছে তাহলে ওর কাছে ফ্রেডির ফটো। আমি এটাকে সাজাতে পারছিলাম না কোনোরকম যুক্তি দিয়েই। একেবারেই বাড়ি যাবার ইচ্ছা আমার নেই বলে আমি খুব মনোরম জায়গা গার্ডেনে চলে গেলাম। যার চারদিকে শুধুই সবুজের সমারোহ এবং মাঝখানে একটা ঝিল। দৃশ্যটা খুবই অপূর্ব একটি বেঞ্চিতে বসলাম গিয়ে, কিছুনারী পুরুষ রয়েছে আশেপাশের বেঞ্চিতে। হঠাৎ একটা গাছের তলাতে চোখ পড়তে আমার শরীর পাথর হয়ে গেল এবং আমি একটু আড়ালে বসলাম সঙ্গে সঙ্গে। আমাকে যাতে ওরা দেখতে না পায়। ওরা গল্পে এতই মশগুল যে আমাকে একেবারে লক্ষ্যই করেনি। আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম আড়াল থেকে। হাসির শব্দ শুনলাম।

কিছু কিছু শব্দ কানে এলেও আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না প্রায় ওদের কথাবার্তা। একটি হিমেল অনুভূতি যেন বয়ে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। আমার মনে হল যেন ঘামছি যখন আমি কপালে হাত রাখলাম। অসুস্থ হয়ে পড়েছি বলে একবার আমার মনে হল। আমি ভেবে উঠতে পারছিলাম না কি করব। কি করা উচিত এই মুহূর্তে আমার। ওকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া উচিত, কি হবে কান টেনে। তাহলে কি ও আরো জেদী এবং অবাধ্য হয়ে উঠবে। সেই মানুষ মরীয়া হয়ে উঠে যখন কারো কোনো গোপন ব্যাপার প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তখন তাকে আর সামলানো যায় না, সে এমন কিছু ভয়ঙ্কর করে বসে। এতো সাহস আর স্পর্ধা ওর। আমি খুব সাবধানে দৃষ্টি রেখেছি ওদের দিকে। বিকেল চলে যাচ্ছে এবং বেশ খানিকটা সময় এইভাবে কেটে গেল। পুরো জায়গাটা আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। দু একজন কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে এ পাশে ও পাশে দেখলাম। ওরা ভেবেছে আমি পাগল বা বিকৃত মানসিকতা যুক্ত। আসলে ব্যাপারটা কী ওরাতো কেউ বুঝতে পারছে না। ওদের অবশ্য সেরকম কোনো অশালীন দৃশ্য দেখতে পেলাম না খানিকটা সময় কেটে যাবার পরও। ওরা পরস্পরের

হাত ধরে রেখেছিল অবশ্য কিন্তু আমার মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিল সেটাও। সহ্য করতে পারছিলাম না আমি একেবারে এবং একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে ইচ্ছা করছিল। নিজেকে সংযত করে বসে রইলাম আমি কোনোক্রমে। ওরা হাত ধরাধরি করে চলে গেল একসময়। আমি অনেকক্ষণ বসে রইলাম ওরা চলে যাবার পরও। বাইরে যদিও অন্ধকার অবশ্য বাগানের ভেতর আলো রয়েছে। একটি অদ্ভুত রহস্যময় পরিবেশ তৈরী হয়েছে আলো আঁধারি মিলে।

একটা গোপন রহস্য দানা পাকিয়ে উঠছে যেন কোথায়। এর আগেও আসা যাওয়া করেছে এরা, এটা নিশ্চয় প্রথম নয়। ও অনেক কিছুই তাহলে গোপনে করে। আমি যখন এর হাতে নাতে প্রমাণ পেয়েছি এখন এর একটা ব্যবস্থা করবো।

হাঁটতে লাগলাম বাগান পেরিয়ে ফাঁকা রাস্তা ধরে। এক দম্পতি আমার পাশ দিয়ে দুজনে দুজনের কোমর জড়িয়ে চলে গেল। মেয়েটি ভদ্র নয় সেটা ওর মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে মনে হল। ওদের বাগানের ভেতর ঢুকতে দেখলাম আমি পিছন ফিরে।

আমি খানিকটা স্বস্তি বোধ করলাম লোকালয়ে পৌঁছে। নানা ধরনের মানুষ যাতায়াত করছে চৌরঙ্গীতে। একমনে হাঁটতে হাঁটতে গাড়িঘোড়ার শব্দ শুনছি। কিছু ভালো লাগছে না। একটি বারে বসে মদ খেলাম। বেশ রাত করে বাড়ি পৌঁছলাম। খাবার চাপা দিয়ে গেছে ডরোথি। শোবার ঘরে গিয়ে দেখি ঘুমোচ্ছ মার্গারেট। মনে হল ওকে শেষ করে দিই। ওর ঘুমন্ত মুখ দেখে একটি সরল বালিকা মনে হল ওকে। ওর কাছে দাঁড়ালাম পোক ছেড়ে। গাউন উঠে গিয়ে পায়ের ডিম দেখা যাচ্ছে। মিমি ঘুমোচ্ছে কাত হয়ে। আমি হাত রাখলাম ওর মাথায় কিন্তু তাতেও ওর ঘুম ভাঙলো না। আমি ওর পাশে শুয়ে

পড়াতে চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল আমার। আমার প্রতিশোধ নেওয়া হল না যদিও নেবো ভেবেছিলাম।

বেশ বেলা করে আমার ঘুম ভাঙলো। রিষ্টওয়াচে দেখলাম আটটা বেজেছে। মার্গারেট নেই পাশে ঘুরে দেখলাম, তাই উঠে বসলাম ধড়ফড় করে। মনে করার চেষ্টা করলাম গতরাতের কথা আমি। এখনো সামান্য ধরে আছে মাথাটা। বাথরুমে চলে গিয়ে স্নান সেরে নিলাম। চেহারায় যে বয়সের ছাপ পড়েছে তা বাথরুমে গিয়ে নগ্ন হয়ে দেখলাম। মাথার চুল পাকা। আমি রোজই দাড়ি গোঁফ কামাই এবং কামিয়েছিলাম গতকাল সকালেই। গতকাল বিকালবেলার কথা এখন কামাতে গিয়ে মনে পড়ল। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল গার্ডেনের সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনার কথা। আবার রাগ জমতে আরম্ভ করলে শরীরে। আমি বারান্দায় গেলাম এরপর সমস্ত কিছু সেরে। একটা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পরছিল মার্গারেট বারান্দায়। একবার আমার দিকে তাকিয়ে যথারীতি আবার মন দিলো খবরের কাগজে। ও আমাকে অবজ্ঞা করছে বলে যেন আমার মনে হল। ওকে সত্যিই অপূর্ব লাগছিল পাশ থেকে। সরল বালিকার মত এখন ওকে আর মনে হচ্ছে না। আমাকে নিয়ে খেলা করছে যেন এক রহস্যময়ীনারী। একটা চেয়ারে সামনাসামনি বসলাম আমি গম্ভীর মুখে। একমনে কাগজ পড়ছে মার্গারেট।

এর মধ্যে আমাদের চা দিয়ে গেল পরিচারিককা ডরোথি। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো, মিঃ ব্রাউন, আপনি কাল রাতে খাননি কেন?

আমি হেসে বললাম, একটু দেরী হয়ে গেছিল কাল আমার ফিরতে।

আমার সামনে থেকে চলে গেল ডরোথি আচ্ছা বলে। চুমুক দিলাম আমি চায়ের কাপে।

এক হাতে কাপ তুলে নিল মার্গারেট কাগজ পড়তে পড়তে।

.

২২.

ও আমার সঙ্গে আগে থেকে কিছু বলতে চাইছেনা এটা আমি বুঝতে পারছি। ওর ভেতর। একটা যেন কোথায় পরিবর্তন ঘটে গেছে। ওর মুখের মধ্যে কোমলতার বদলে কঠিনতা। শেষ করলাম দুজনে চুপচাপ চা খাওয়া। রাগে ফুলছিল আমার শরীরটা এবং আমি মার্গারেটকেবললাম, একটু ঘরে চলল।

খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলে ও এর কারণ জিজ্ঞেস করল।

আমি আবার বললাম, আমার দরকার আছে।

নিস্পৃহভাবে ও খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলে বলল, যা বলার তা এখানেই বলো।

আমি এবার বললাম একটু জোরে, ঘরে যেতে বলেছি না তোমাকে।

ভাল লাগছে না এখন ঘরে যেতে।

ওর ইচ্ছা নেই তা সত্ত্বেও ও হেসে উঠল এবং তখন আমি উঠে পড়লাম। আমাকে ভেতর ভেতর আরো জ্বালিয়ে দিল ওর সেই হাসির ন্যাকামি। আমি বললাম, যেতেই হবে তোমাকে।

মার্গারেট বলে উঠল, একটু পরে যাচ্ছি।

পরে নয় এক্ষুনি, এই বলে আমি ওর হাতটা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এলাম ঘরের ভেতর এবং ওকে ছুঁড়ে দিলাম বিছানার উপর। ও ছিটকে পড়লো বিছানার উপর। ও চোখদুটো বড়ো বড়ো করে ঢোক গিলে আবার বলল, হয়েছেটা কি?

আমি তাকালাম ওর দিকে স্থির চোখে এবং বললাম, কোথায় গিয়েছিলে কাল বিকালে তুমি?

সঙ্গে সঙ্গে ও জবাব দিল, আমি যেখানেই যাই না কেন সেখানে নিজের ইচ্ছায় গেছিলাম।

ছুটে আমি আমার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলাম। ডরোথি কিংবা অন্য কেউ এসে পড়ুককথার মাঝখানে সেটা আমি চাইনা। এবার আমি দাঁড়ালাম গিয়ে মার্গারেটের সামনে। আমি বললাম, আমি এখন তোমার অভিভাবক, এটা তোমার ব্যাপার নয়, তুমি যখন যা করবে তা আমার অনুমতি নিয়ে করবে।

মার্গারেট ঝাঁঝিয়ে বলল, আমি এসেছি তোমার সঙ্গে আমার নিজের ইচ্ছায়, তাই বলে তুমি আমার অভিভাবক হতে পারো না। আমাকে নিয়ে আসার এতটুকুও ক্ষমতা তোমার

ছিল না যদি আমি না নিজে আসতে চাইতাম। আমার এই দেহের উপরেই যতো লোভ তোমার, কারণ তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছ।

আমি আবার বললাম, তোমার কাছে কেন রেখেছ ফ্রেডির ফটো?

ও আমার একমাত্র বন্ধু সেই কারণেই নিজের ইচ্ছায় রেখেছি আমি।

আমি ওর গালে একটা সজোরে থাপ্পড় মেরে বললাম, ও তোমার বন্ধু, বাঃ আর আমি তোমার কেউ নই?

মার্গারেটের দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল এবং ও গালে হাত দিল। জ্বলন্ত চোখে ও সেই অবস্থাতেই বলল, তোমার কাছে আমি থাকবো না।

ক্রমশঃ আমার এত রাগ বেড়ে যাচ্ছিল, যে ওকে আমি ভীষণ ভাবে মারলাম একটা বেল্ট দিয়ে। একবারের জন্যেও চীৎকার করে কাঁদলো না মার্গারেট, কি আশ্চর্য! আমি শান্ত হলাম বেশ খানিকক্ষণ পরে। উপুড় হয়ে শুয়েছিল মার্গারেট, আমি চুপচাপ হাত দিয়ে বসে রইলাম মাথায়, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেল্টটাকে। আমার কিছুই ভাল লাগছেনা এবং এইভাবে কাটলো ঘণ্টাখানেক। আমি বাইরে বেরিয়ে গেলাম এবং উপুড় হয়ে শুয়ে রইলো মার্গারেট। ডরোথির কাছে আমি প্রথমেই গেলাম।

বেশ ঘাবড়ে গেল ডরোথি আমার উদভ্রান্তের মত চেহারা দেখে।

কি হয়েছে আপনার, সে জিজ্ঞেস করল। আমি একরকম জোর করেই মৃদু হাসলাম, বললাম, ভিক্টর কোথায়, আমার কিছু হয়নি।

ডরোথি জবাব দিল, বেরিয়ে গেছে তো ভিক্টর।

আমি বললাম, ও এলে বলবে, খুব জরুরী দরকার আমার, আমি বেরোচ্ছি, ও এলে নিশ্চয় আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

একটু অবাক হয়ে ডরোথি বলল, এলেই বলব, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

আমি বললাম, বল।

কোনো খারাপ খবর আছে কি? ও জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম হেসে, তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারে যে, কোনো খারাপ খবর নেই। আমি সোজা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম এই কথা বলে। এলোমেলোভাবে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম রাস্তায়। আমার রীতিমতো অনুশোচনা হচ্ছে কারণ আমি এই প্রথম গায়ে হাত তুলেছি আমার প্রিয়তমার। মার্গারেটের একটা স্বাধীনতা নিশ্চয় আছে যদিও সে আমার প্রিয়তমা হোক না কেন। আবার এটাও ঠিক যে আমি ওকে ভালবাসি, তাই এটাই বা কেমন করে হয় যে ও আমাকে অবজ্ঞা করে অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘুরবে এবং ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশবে। ওর কাছে থাকবেই বা কেন আমার বন্ধুর ছবি। ক্ষতিই বা কি, যদি আমার বন্ধুর ছবি ওর কাছে থেকেই থাকে। এটাই বা কেমন করে হয় যে আমি ছাড়া ওর আর অন্য কোনো পুরুষ বন্ধু থাকবে না। এই সব ব্যাপারটাই ওর নিজস্ব। আমার বোকামি।

বাড়ি ফিরলাম, ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ আর তুলো কিনে নিয়ে। আমি ওর গায়ে হাত দিলাম। দেখলাম ও এই ভাবে শুয়েই রয়েছে এবং ঘুমিয়ে পড়েছে। অসহায় লাগছে ওর মুখটা রীতিমতো। ও নিশ্চয়ই ভালবাসে আমাকে। আমার সঙ্গে নাহলে এখানে ও চলে আসতে পারে না। ওকে ডাকলাম আমি আলতো করে, ওর দেহে দু এক জায়গায় কালসিটে পড়েছে। বললাম, মিমি মিমি, আমি এসেছি উঠে পড়ো।

মার্গারেট ঘুমোচ্ছিল গভীর ভাবে এবং সেই কারণেই আমি ডাকতে ও উঠে বসলো ধড়ফড় করে। আমি বললাম, শুয়ে থাকো, একদম উঠবে না।

আমার নির্দেশ পালন করলো মার্গারেট একেবারে বাধ্য মেয়ের মত। ওর আঘাত লাগা জায়গাগুলোতে আমি ওষুধ লাগিয়ে দিলাম তুলে দিয়ে। পিঠে, মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আমি বললাম, আমায় তুমি ক্ষমা কর মিমি, হিতাহিত জ্ঞান ছিল না তখন আমার। লক্ষীটি কিছু মনে করো না, এরকম হবে না আর কোনো দিন।

মার্গারেট কিছু না বলে চুপচাপ শুয়ে রইল। পরম আবেগে একটা চুমু খেয়ে আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম এবং ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। ওকে নিয়ে সেদিন খাওয়া দাওয়া শেষ করে কলকাতার বিভিন্ন দিকে বিশেষ করে উত্তরের দিকটায় ঘুরলাম। লোকজনের ভিড় কেশ এখানটায়। দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার সেদিনই সেই বিখ্যাত বাংলা ছবিটা। ছবিটা হচ্ছিল একটি মাঝারী ধরণের বাংলা সিনেমা হলে। তেমন একটা ভিড় নেই অবশ্য হলে ঢুকে দেখলাম। আমাদের দেখে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল আমাদের আশে পাশে যারা বসেছিল। আমরা যেহেতু বিদেশী সেহেতু অনেকেরই ধারণা হল যে আমরা ছবিটা বুঝবো তো! আমরা প্রায় আড়াই ঘণ্টা ছবিটা দেখলাম তন্ময় হয়ে।

আমি এর আগে এত গভীর এবং মানবিক ছবি দেখেছি বলে আমার মনে হল না। ছবিটি বিশ্ব জয় করার মত। ধন্যবাদ জানালাম হল থেকে বেরিয়ে ছবিটির যুবক পরিচালককে। যুবকটির বাবা নাকি সাহিত্যিক ছিলেন। এটাই নাকি তার প্রথম ছবি। একটি বিজ্ঞাপন কোম্পানির কর্মাশিয়াল আর্টিস্ট ছিল যুবকটি। তার আঁকা নাকি এখানকার অনেক বইয়ের কভারও। তার নিজের আঁকা যে কাহিনী নিয়ে তিনি ছবি করছেন তার কভার এবং ভিতরের ছবিটিও। ক্যালিওয়ার্ক ভালই জানেন।

অনেকটা ছবি দেখার পর মার্গারেটের মন ভালো হল। ও হলের মধ্যে মাঝে মঝে আমার হাত চেপে ধরছিল। খুব ভাল লেগেছে ওর ছবিটা। একটা রেস্তোরাঁয় নানারকম খাবার খেলাম আমরা। ও উজ্জ্বল আবার আগের মতোই। হেসে কথা বলল ও আমার সঙ্গে। ছবিটা নিয়ে অনেক কথা বললাম। রাত আটটায় পোশাক পাল্টে চেয়ারে বসে আমি আমার একটা হাত মার্গারেটের কাঁধে রাখলাম।

ভিক্টরের সঙ্গে আমি গার্ডেনে গিয়েছিলাম কাল বিকালবেলা, তুমি ছিলে না। এই সময় ও বললো যে চলো একটু গার্ডেনে ঘুরে আসি, তাই গার্ডেনে পৌঁছলাম ঘুরতে ঘুরতে, তোমাকে বলা হয়নি, কারণ তুমি ছিলে না। ও একটু থেমে আবার বলল, ও আমার গুণমুগ্ধ শ্রোতা এবং বন্ধু।

আমি হেসে বললাম, ভিক্টর খুব ভালো ছেলে, তা তুমি নিশ্চয় ওর সঙ্গে যাবে।

আমি আর তুললাম না ফ্রেডি ছবিটার কথা।

আমরা ঘরে এলাম রাতের ডিনার শেষ করে। আমার প্রিয়তমা মিমি, আমার মার্গারেটকে গোলাপী রঙের গাউনে চমৎকার লাগছিল। মার্গারেট বিছানায় শুয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটা অর্থেই হাসলো। আমার রক্ত গরম করে তুলেছে ওর কটাক্ষ। ঘরে তখন মান আলো জ্বলছিল এবং ওর কাছে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম একটার পর একটা। মার্গারেট, আমি ক্লান্ত দেহে শুয়েছিলাম এবং নিজেরাই ভাল করে জানিনা কখন যে দুজনের চোখে ঘুম নেমে এসেছে। দীর্ঘকাল পরে আমি এতখানি আনন্দ পেলাম মার্গারেটের সঙ্গ পেয়ে।

.

২৩.

সকাল থেকে আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ এবং ঘন হয়ে গেছে কালো মেঘে। কলকাতার বুকে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমাদের টেবিলে অনেকক্ষণ চা দিয়ে গেছে ডরোথি। নিজের মনে আমি চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম এবং সামনের দিকে তাকাচ্ছিলাম। বৃষ্টি নামল কিছুক্ষণের মধ্যে। মার্গারেট তখনো ঘুমোচ্ছিল বলে ওকে আমার আর জাগাতে ইচ্ছা করল না। আমরা অনেক রাতে ঘুমিয়েছি গতকাল। অনেকদিন পর শান্তিতে ঘুমোচ্ছ মার্গারেট বলে মন চাইছে না ওকে বিরক্ত করতে। আমার সঙ্গে ওর রোজই প্রায় ঝগড়াঝাটি হচ্ছে এবং বর্তমানে কাটিয়ে দেওয়া গেছে। সেই অবস্থাটা। বৃষ্টি দেখছিলাম আমি চুপচাপ এবং সেই বৃষ্টির মধ্যে ঝড় কাকের মত হঠাৎ ছাতা নিয়ে হাজির হল ভিক্টর। ওর দেহের অনেকটাই ভিজে গেছে ছাতা থাকা সত্ত্বেও। আমার কাছে এসে ও হাজির হয়ে বোকার মত হাসলো ছাতাটা বাইরে রেখে। ওর হাসিটা খুবই সরল

এবং ওর মধ্যে এখনও ছেলেমানুষি ভাব যায়নি তাই বেশ ভাল লাগছে ওকে দেখে। অবাক হয়ে বললাম, এতো ঝড় জল মাথায় করে, কি ব্যাপার ভিক্টর?

ভিক্টর হেসে বলল, মা বলল, খুব জরুরী প্রয়োজনে আপনি আমাকে ডেকেছেন আংকল, তাই আমি চলে এলাম।

ডরোথিকে বলেছিলাম একবার ভিক্টরকে পাঠিয়ে দেবার কথা এবং সেই কারণেই হয়তো ও পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি ব্যাপারটা একেবারে ভুলেই গেছিলাম কিন্তু তা মনে পড়লো এবারে। বোসো, হেসে বললাম। চা দিয়ে গেছে ডরোথি ইতিমধ্যে। ভিক্টর অপেক্ষা করতে লাগল চায়ে চুমুক দিতে দিতে। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভেবে পাচ্ছিলাম না কিভাবে কথাটা বলব, কারণ আমার মনে কোনো বল নেই এই মুহূর্তে। ভিক্টরই বলে ফেলল অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে, একটু গার্ডেনে গিয়েছিলাম আমি কালকে মার্গরেটকে নিয়ে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম কারণ আমার ভালই লাগলো ওর কাছ থেকে কথাটা শুনে। তাই বললাম, আমি শুনেছি কারণ মিমি আমাকে বলেছে।

ভিক্টর আবার বলল, যেতে চাইছিল না মার্গারেট প্রথমে আমার সঙ্গে, আপনি এসে রাগ করবেন বারবার বলছিল, তাই ওকে অনেক কষ্ট করে নিয়ে গেছি আমি।

সিগারেট ধরালাম আমি। আমি সাধারণত মনের ভেতর উত্তেজনা না হলে সিগারেট খাই না। সিগারেটে টান মেরে বললাম, খুব ভাল করেছে, মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে একটু

এদিক ওদিক যেও, আমার অনুমতির দরকার নেই সব সময়, তুমি থাকলে আমি নিশ্চিন্ত, তুমি ইচ্ছা করলে ওর প্রিয় বন্ধু হতে পার।

ও কিছুটা অবাক হয়ে আমার কথায় বলল, ও খুব সরল মেয়ে, তবে ও বকে খুব বেশী।

ওর কথা শুনে আমি হেসে বললাম, তুমি ঠিকই বলেছো, বড় বেশীবকা ওর অভ্যাস, আবোল তাবোল কথা বলে, ওকে শর্টহ্যারল্ড, টাইপ শিখতে দিয়েছি কিন্তু ও আজ অবধি তা ঠিকমতো শিখতে পারলো না। এতো বুদ্ধি কম হলে, ওর যে কি হবে!

ওর যথেষ্ট বুদ্ধি আছে এবং শর্টহ্যারল্ড টাইপেও যথেষ্ট স্পীড আছে।

আমি সজোরে হেসে উঠলাম, তুমি তো ওর এত বেশী গুণগ্রাহী হয়ে পড়ছ এর মধ্যে যে এতটা বেশী পরিমাণ ভক্ত হয়ে যাওয়া–এটা একদমই ভাল লক্ষণ নয়।

এই বলে আমি হেসে উঠলাম এবং লক্ষ্য করলাম ভিক্টর তাকিয়ে রয়েছে ফ্যালফ্যাল করে এবং ওর মধ্যে মার্গারেটের উপর প্রেমের চেয়ে বেশী একটা গুণমুগ্ধ ভাব গড়ে উঠেছে। ওকে নিয়ে মার্গারেট যা ইচ্ছা করতে পারে এখন। আমি বললাম, মার্গারেটকে তুমি বাংলা শেখাবে বলেছিলে, তা শিখাবে কবে থেকে?

ভিক্টর চুপ করে রইল। কালো হয়ে আসছে আকাশ। বৃষ্টিও হচ্ছে প্রচণ্ড। সঙ্গে বইছে ঝড়ো হাওয়া। ভিক্টর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে খানিকক্ষণ সময় নিয়ে বলল, আমি শেখাতে আরম্ভ করব সেদিন থেকেই যেদিন থেকে আপনি বলবেন।

তুমি আরম্ভ কর আগামী সপ্তাহ থেকে।

ভিক্টর আমার কথায় ঘাড় নাড়াতে আমি একটা সিগারেট ধরালাম। প্রচণ্ড দুর্যোগ চলছে বাইরে। আমার হাতের মুঠোর মধ্যে যেমন করে হোক রাখতে হবে এই সাদামাঠা ছেলেটিকে। এতে কোন অসুবিধা হবে না। আমি ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার কি কোনো অসুবিধা আছে আমার কাছে কাজ শিখতে ভিক্টর।

আমি থেমে যেতে ভিক্টর উৎফুল্ল হয়ে বলল, আমিতো কিছুই জানি না এবং এতে কিন্তু কোনো অসুবিধা হবে না আমার।

আমি তোমাকে সবকিছু শিখিয়ে নেব এবং এতে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

আমি ঘড়িতে দেখলাম বেশ বেলা হয়েছে এবং বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণ দেখছিনা তাতে। তবে আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে আস্তে আস্তে। আমি বললাম, আমি একটু আসছি, বসো ভিক্টর।

মার্গারেট ঘুমোচ্ছ এখনও পর্যন্ত, ওকে জাগাতে হবে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম ও বিছানায় নেই, বাথরুমে। দরজা বন্ধ, তাই মৃদুভাবে টোকা দিতে ও বলল মিষ্টি গলায়, চান করছি, জলের শব্দ আসছিল বাথরুম থেকে।

দরজায় আবার টোকা দিতে ভিতর দিকে সাড়া এল, খোলা আছে দরজা।

আমি দরজাটা খুললাম মৃদু ভাবে টোকা দিয়ে। মার্গারেটের দেহ ভেজা কারণ ও স্নান করছিল। ওর ভিজে ঠোঁটে চুমু খেলাম এই অবস্থায় ওকে জড়িয়ে ধরে। আমার সারা দেহ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল একটা আশ্চর্য সুখের অনুভূতি। আমাকে জড়িয়ে মার্গারেট আদুরে ভঙ্গীমায় বলল, এখনতো বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, কেমন হয় বৃষ্টিতে ভিনজলে?

শরীর খারাপ হবে এতে, বললাম আমি কপট ধমক দিয়ে।

খিলখিল করে হেসে বলল মার্গারেট, হোক শরীর খারাপ, ভিনজবো আমি তবু। আমি মুছিয়ে। দিতে লাগলাম ওর দেহটা পরম মমতায় হ্যাঁঙার থেকে একটা তোয়ালে পেড়ে নিয়ে। ও খিলখিল করে হেসে উঠছিল এবং মাঝে মাঝে ছটফট করছিল। আমি পাঁজাকোলা করে ওকে তুলে নিলাম ভাল করে মুছিয়ে দিয়ে। ও পা দুটো ছুঁড়ে বলে উঠল, তুমি আমাকে এই ভাবে নিয়ে চলো বৃষ্টিতে।

আমি চাই না এতে তোমার শরীর খারাপ হোক।

উঠে এলো মার্গারেট এবং হেসে বলল, তোমার শুধু শরীর খারাপের অজুহাত কারণ তুমি সেকেলে ভীষণ। আমার ভাবতেই খুব খারাপ লাগছে যে আমাকে সারাজীবন কাটাতে হবে তোমার সঙ্গে।

কোনো জবাব দিলাম না এবং বললাম, আমি বাইরে বসে আছি। তুমি পোষাক পরে নাও তাড়াতাড়ি।

বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে দেখি ভিক্টর বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। একবার আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ও মৃদু হাসলো। আমি ওর পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলাম। বৃষ্টি কমে এসেছে, আমার টাকার দরকার, তাই একবার লন্ডনে খবর দিতে হবে। যদিও আমার টাকার দরকার কোন অভাববোধে আমি ভুগছি। মার্গারেট এসে মুখোমুখি চেয়ারে বসল মিনিট পাঁচেক পরে এবং ভিক্টরকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং বলল, তুমি কখন এসেছে ভিক্টর?

মৃদু হেসে ভিক্টর জবাব দিল, অনেকক্ষণ এসেছি, তুমি এই বৃষ্টিতে খুব ঘুমোচ্ছিলে, ও সামান্য বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল।

মার্গারেট হেসে বলল তবে বেলা তেমন একটা হয়নি। চিরুনী দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিল ও এবং ঘাড় অবধি ওর চুল নেমে এসেছে। ওকে বেশ বেপরোয়া মনে হচ্ছে কারণ ওর পরনে একটি প্যান্ট এবং রঙীন শার্ট।

আমি তাকালাম মার্গারেটের দিকে, আগামী সপ্তাহ থেকে ভিক্টর তোমায় বাংলা শেখাবে মিমি।

মার্গারেট আমার এবং ভিক্টরের পরস্পরের দিকে তাকাল। কিছু না বলে খবরের কাগজটা টেনে নিল। কাগজ পড়তে লাগলো ও চিরুনীটা পাশে রেখে। আমি তাকালাম মার্গারেটের দিকে এবং দেখলাম যে ভিক্টরও মার্গারেটকে দেখছিল। ওর চাহনিতে কৃতজ্ঞতার ছাপ কিন্তু তাতে কোনো পাপবোধ নেই। আমরা যে ওকে আমল দিয়েছি

এতেই ও খুশী। ভিক্টরের দিকে ছুঁড়ে দিল মার্গারেট খানিকটা কাগজ পড়ার পর। এরই মধ্যে কাগজ পড়া শেষ হয়ে গেল তোমার, ভিক্টর হেসে বলল।

আমি শুধু সিনেমা আর খেলার পাতাটাই দেখি, আমার কাগজের অন্য কোনো খবর পড়তে ভাল লাগে না।

ভিক্টর সজোরে হেসে বলল, তোমার তো পৃথিবীর আর কোনো জিনিষ ভালো লাগে না ঐ দুটো ছাড়া। তাকিয়ে দেখলো মার্গারেট ভিক্টরের দিকে একবার। আমি ব্যস্ত ছিলাম তখন অন্য একটা কাগজ পড়ায়। আমি জরীপ করছিলাম ওদের দুজনকে তারই ফাঁকে ফাঁকে। এছাড়া আমার উপন্যাস, বিশেষ করে প্রেমের, পড়তে খুব ভালো লাগে।

হোঁচট খেলাম আমি কিন্তু তবু মার্গারেটের দিকে তাকালাম না এবং কাগজ পড়তে লাগলাম।

ভিক্টর হেসে বলল, তোমার তো উপন্যাস পড়তে ভাল লাগে, আমারও লাগে, আমি প্রায় সব লেখাই পড়েছি শেক্সপিয়ারের, আমার খুব ভালো লাগে শেক্সপিয়ারকে।

মার্গারেট হেসে বলল, তোমাকে আমার একজন পরিচিত লোকের উপন্যাস পড়তে দেব, এই বলে মার্গারেট আমার দিকে তাকাতে আমি ভাবলাম সে হয়তো আমাকে পরীক্ষা করতে চাইছে। তাই আমি কাগজ পড়তে লাগলাম নিস্পৃহ ভাবে। এবার জিজ্ঞেস করলো ভিক্টর, কি নাম ভদ্রলোকের?

লন্ডনের একটা কাগজের সাংবাদিক এবং লেখক ফ্রেডি উইলসন। থেমে থেমে বলতে লাগলো যে, ভদ্রলোক খুবই সুপুরুষ এবং ভালো লেখে, একটা ছবি ভদ্রলোকের আমার কাছে আছে, নাম আছে ভদ্রলোকের সাংবাদিক হিসাবেও।

মার্গারেট আমাকে পরখ করতে চাইছে নিশ্চয় আমার সামনে আমার বন্ধু ফ্রেডির প্রশংসা করে। এটা ঠিক নয় যে আমার ভেতরে একটা চিনচিনে যন্ত্রণা হচ্ছিল না কিন্তু নিস্পৃহ ভাবে তবু আমি কাগজ পড়তে লাগলাম। বাইরে রোদের আভাস তখন, কারণ বৃষ্টি থেমে গেছে। তাকিয়ে, দেখলাম ভিক্টরের দিকে যে ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে।

মার্গারেটকে জিজ্ঞেস করলো, কি নাম উপন্যাসের?

নামটা বললো মার্গারেট উপন্যাসের। আমি তাকিয়ে বললাম ভিক্টরকে, আমাদের কফি দিয়ে যেতে বলতে একবার তোমার মাকে ভিক্টর।

ভিক্টর রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে আমি মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে হাসলাম এবং বললাম, তুমি আজকাল নিজেকে খুব চালাক ভাবছো মার্গারেট।

তোমার এসব ভুল ধারণা, কে বলেছে এসব? ও হেসে উঠতে আমি বললাম, আমার ঈর্ষা নেই ফ্রেডির উপরে কারণ ফ্রেডি আমার বন্ধু।

আমি বলতে ও ওর সেই রহস্যমাখা হাসিটি মৃদু হাসলো। ভাবা যায় না ওর মাঝে রহস্যময়ী হয়ে ওঠাটা। তখন আমার কাছে ও সম্পূর্ণ অচেনা হয়ে যায় এবং ওকে তখন

আর চিনতে পারিনা আমি। আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে তখন ওর মনের তল পাওয়া। তোমার কি ফ্রেডিকে খুব ভালো লাগে, আমি জিজ্ঞেস করলাম মার্গারেটকে।

ভনিতা না করেই মার্গারেট বললো, আমি খুব কমই দেখেছি ফ্রেডির মত লোক।

আমি কি উত্তেজিত হচ্ছি ভেতর ভেতর, তাই আমি চুপ করে রইলাম। আমি ঠিক বলতে পারছি না যে আমি উত্তেজিত হচ্ছি কিনা। আমি তাই না থাকতে পেরে জিজ্ঞেস করলাম, ফ্রেডির কোন দিকটা তোমার বেশী ভালো লাগে মিমি?

ফ্রেডি খুবই সমানুষ, ওর সবকিছু, বিশেষ করে ওর আচরণ আমার খুবই ভালো লাগে।

আমার আর জবাব দেওয়া হল না যেহেতু ভিক্টর এবং ডরোথি এসে পড়ল। ডরোথি ট্রে টেবিলের উপর রেখে মৃদু হাসলো, কফি দিলো তারপর আমাদের। আমি আকাশের দিকে তাকালাম কফিতে চুমুক দিতে দিতে। রোদ অদৃশ্য হয়ে গেছে, আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে, সম্ভবতঃ ঝড় উঠবে বলে।

.

২৪.

মার্গারেটের গর্ভে সন্তান এসেছে তা ধরা পড়ল মাস তিনেকের মাথায়। মাথা ঘুরে পড়ে গেছিল এবং একদিন খাবার পরে বমি করলো এবং কোনো রুচি ছিলনা ওর খাবারে। আমাকে কিছু জানায়নি ও, চেপে গিয়েছিল, ডরোথি একমাত্র জানতে পেরেছিল। বাড়ির

পরিচারিককার থেকে মিমির সন্তান হবার লক্ষণ জেনে নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে, আপনার আত্মীয়ার পেটে বাচ্চা আছে, ডাক্তার হাসি মুখে জানাল আমাকে।

সন্তান এসেছে মাস তিনেক হল, মাস তিনেক আগে আমরা দিল্লী থেকে এসেছি। আমি রীতিমতো গম্ভীর হয়ে গেলাম ডাক্তারের কথায়। রক্ত উঠে গেল আমার মাথায়। এ সন্তান আমার নয় এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত। আমি খুবই সাবধানে প্রত্যেকবার মিলিত হয়েছি। মার্গারেটও ভোলে না প্রতিদিন সাবধান হতে। আমার সন্দেহ সেই কারণেই বাড়তে লাগলো ক্রমশঃ। মাস তিনেক আগের সেই রাতের কথা মনে পড়ল। দিল্লীতে তখন আমরা এবং অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। মার্গারেট ফিরছিল না কিছুতেই। তারপর আমি দেখলাম ও ফ্রেডির সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল। আমি ওকে রীতিমতো মেরেছিলাম ফেরার পর। কোনো রকম প্রতিবাদ করেনি ওর মতো জেদী মেয়ে, আমার পরিষ্কার মনে আছে সেটা। মার খেয়েছিল চুপচাপ। কোথায় যেন একটা অপরাধে কষ্ট পাচ্ছিল ও এই বলে আমার মনে হচ্ছিল। ফ্রেডিই কি তবে সবকিছুর মূলে?

বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি কিছুতেই, এবং ওর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম আমি সেই রাতেও। আমি সাবধান ছিলাম। আমি ভুলিনি সাবধান থাকতে হয় প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে। কিছুদিন নার্সিংহোমে রাখতে হবে এখন মার্গারেটকে। ওর শরীর খুব দুর্বল হয়ে গেছে এবং ওকে রাখাটা ঠিক করলাম আমি ডাক্তারের পরামর্শেই।

কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমি কি করব। অস্থির লাগছে নিজেকে ভীষণ এবং বারবার মাথাটা গরম হয়ে গেছে। মার্গারেটের গর্ভে আমার সন্তান যে আসেনি এটা আমার স্থির বিশ্বাস। এই সন্তানটি তাহলে কার?

ঘড়িতে ঢং ঢং করে সকাল নটা বাজল। আমি তখন বসে আছি বারান্দায়। হাওয়ার বেগ আজ একটু বেশী। চা দিয়ে ডরোথি জিজ্ঞেস করল আমাকে, কেমন আছে আজ মিমি?

ও ওখানে কিছুদিন থাক, কারণ ওর শরীর খুব দুর্বল।

ডরোথি বলল আমার কথার জবাবে, মিঃ ব্রাউন, থাকাই ভাল; কিন্তু আপনি কি একেবারেই বুঝতে পারেননি যে ঐ ঘটনা কি ভাবে ঘটল?

বাড়ির পরিচারিককার সঙ্গে আমি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইছিলাম না তাই বললাম, প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের তো একটা স্বাধীনতা থাকে, আমিতো ওকে সবসময় নজরে রাখতে পারি না।

এ সমস্ত কথাবার্তা যে আমি পছন্দ করছিনা ডরোথি সেই কারণে সে তত ঠিক, এই কথা বলে চলে গেল। বসে রইলাম আমি নিঃসঙ্গ ভাবে কারণ এই মুহূর্তে নার্সিংহোমে শুয়ে আছে মার্গারেট ওর শরীর খুব দুর্বল এবং ওকে আমি নিয়ে আসব দিন কয়েক বাদেই। হঠাৎ চা খেতে খেতে বুকে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করলাম, আমার মাথা ঘুরছে এবং আমার মনে হল যে আমার শরীরটা খারাপ। বেশ চনচনে রোদ বাইরে। পাখাটা ফুলস্পীডে চালিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম এবং ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম একটা ছেলে হয়েছে মার্গারেটের। মার্গারেটের এবং ছেলেটির উভয়েরই দুটো পাখা। মার্গারেট ছেলেটাকে

কোলে নিয়ে দুরের আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে একসময় দেখলাম। আমার কপালে ঘাম জমেছে এবং একসময় আমি চীৎকার করে উঠলাম। হাত উঠলো না যদিও হাত বাড়িয়ে চীৎকার করতে গেলাম এবং ঠিক উঠে বসতে যাব, ডরোথি ভাকল সেই সময়।

ওরকম চীৎকার করছেন কেন মিঃ ব্রাউন, উঠে পড়ুন বেলা হয়েছে।

আমি ধড়ফড় করে উঠে বসাতে, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ডরোথি বলে উঠল, বেলা হয়েছে মিঃ ব্রাউন, উঠে পড়ুন, ওরকম চীৎকার করছেন কেন? কোন, অসুস্থবোধ করছেন কি আপনি?

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আমি বললাম, আসলে একটা বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম, কিছু হয়নি কিন্তু আমার।

স্নান করে নিন, লাঞ্চ রেডি, ডরোথি বললো।

কোনোক্রমে উঠে বাথরুমে ঢুকে গিয়ে স্নান করাতে নিজেকে বেশ ঝরঝরে লাগল। শেষ করে ফেললাম খাওয়া দাওয়া মিনিট পনেরোর মধ্যেই। সিগারেট ধরালাম বারান্দায় এসে। আমি যখন মানসিকভাবে অস্থির থাকি তখন আমার একটু সিগারেট খাওয়াটা বেড়ে যায়। ধোঁয়াটা ছাড়তে সেটি কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল।

গর্ভে সন্তান এসেছে মার্গারেটের। আমি যে মার্গারেটকে ভালবাসি, তার এখন অন্ধকার জঠরের ভিতর কার ভ্রূণ বড় হচ্ছে!

মার্গারেটের ওখানে বিকালবেলা গিয়ে আমি দেখলাম যে ওর গায়ের উত্তাপ দেখছিল নার্স। খানিকটা সরে দাঁড়ালো আমাকে দেখে মৃদু হেসে। এখন টেম্পারেচার কত, আমিও মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলাম।

নার্স জবাব দিল থার্মোমিটার দেখতে দেখতে, জ্বর এখন সামান্য আছে।

মার্গারেটের মুখটা কেমন ফ্যাকাশে লাগছে, আমি তাকালাম মার্গারেটের মুখের দিকে। আমাকে দেখে তবু ও মৃদু হাসলো। জিজ্ঞেস করলাম ওর কপালে হাত রেখে, কেমন আছো এখন?

ভালো বোধ করছি এখন একটু।

মার্গারেট বালিশ হেলান দিয়ে বসল। ওর পেটে যে বাচ্চা এসেছে, তা ওকে জানান হয়নি এখনো। বলতে নিষেধ করেছি ডাক্তার বা নার্স সবাইকেই। ওর পেটে যে ও কার ভালবাসার ফসলকে বয়ে নিয়ে চলেছে তা এখনও জানে না মার্গারেট। ওকে বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানাব বলে আমি ঠিক করেছি। ওকে জানানো হয়ত ঠিক হবে না কারণ এখন ও খুবই দুর্বল। ও সুস্থ হয়ে উঠলেই আমি নষ্ট করে ফেলতে চাই ওর এই অবাঞ্ছিত বাচ্চাটি। পরম স্নেহে মার্গারেটের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম আমি। ঘুণাক্ষরে যেন ডরোথি ওকে না জানায় যে ওর পেটে বাচ্চা আছে, সে কথা ডরোথিকে বলে দেওয়া হয়েছে। একবারে কিশোরী বালিকার মতো মার্গারেট, যদিও ওর বয়স হয়েছে। ও হয়তো ভাবেইনি যে ও গর্ভবতী হয়েছে। ওর মাথায় আমি হাত বুলাতে লাগলাম অনেকক্ষণ ধরে। ও কাঁধের উপর রেখেছে ওর একটা হাত। বেরিয়ে গেছে নার্স

এবং একা রয়েছে মার্গারেট ঘরে। ছিমছাম ঘরটি যদিও খুব বড়ো নয়। একটা ফোটো রয়েছে দেখলাম দেওয়ালে, তাতে বাচ্চা যীশু রয়েছে মাতা মেরীর কোলে। ফোটোটার দিকে তাকিয়ে দেখতে বেরিয়ে এল একটা কথা হঠাৎই কুমারী মাতা মেরী।

মেরীর কি বিয়ে হয়নি? সরলভাবে জিজ্ঞেস করলো মার্গারেট।

আমি বললাম, না।

ওর বাচ্চা হলো কি করে তাহলে?

আমি বললাম, মার্গারেটের প্রশ্নের জবাবে, যোশেফ ছিল তো মেরীর প্রেমিক হিসাবে।

মার্গারেটকে আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, তোমার তো এখনও বিয়ে হয়নি মিমি, তবু তোমার যদি এখন বাচ্চা হয় তবে তোমার কেমন লাগবে?

মার্গারেট খিল খিল করে হেসে বলল, আমার খুব ভালো লাগবে, আমি ওকে মানুষ করতাম, যদি আমার একটা বাচ্চা হত।

চমকে উঠলাম আমি। সরলভাবে ও কথাগুলি বলল নাকি ও মূর্তিমতী শয়তান। ও জানে কি যে ওর পেটে বাচ্ছা আছে। বুঝতে পারছি না আমি কিছুই। মার্গারেট যদি জেনে শুনে এই সমস্ত কথা বলে তো ওর মতো পাকা অভিনেত্রী তাহলে খুব কমই আছে এটা মনে করব। আমার হাতের উপর হাত রেখে মার্গারেট বললো, কবে নিয়ে যাবে তুমি আমাকে এখান থেকে?

তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই, দু এক দিন অপেক্ষা করো, ভালো হোক তোমার শরীরটা একটু, তারপর তোমাকে নিয়ে যাব।

আমার ভেতরটা রীতিমতো অস্থির তাই আমি বলে উঠলাম স্বাভাবিকভাবেই। নিজেকে সংযত রাখতে আমি চেষ্টা করছি তবুও প্রাণপনে। এটা মার্গারেটের অপরাধ না ভুল সেটাই আমি ভাবছিলাম। আমি কি ওকে ক্ষমা করতে পারব যদি এটা অন্য কারো সন্তান হয় কে জানে। এটা বলা একেবারেই সম্ভব নয় তবে আমার প্রেমিকা যেহেতু মিমি, তাই অনেকদূর এর জন্য এগোতে পারি আমি। আমি ক্ষমা করতে রাজী ওর হাজার অপরাধ হলেও। যদিও এটা সামান্য ভুল। নিশ্চয় পারবো আমি ওকে এর জন্য ক্ষমা করতে। চুমু খেলাম মার্গারেটকে আমি নীচু হয়ে। দু চোখ বুজে রইল ও। হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম ওর চুলে মাথায়। চুপচাপ বেশ খানিকটা সময় কাটাবার পর মনে হল, কোনো এক অচেনা পরিবেশে ঢুকেছি আমি, যেহেতু একটা নিজস্ব গন্ধ আছে নার্সিংহোমের, তাই এটি একটি অদ্ভুত পরিবেশ। আমি কোনোক্রমেই যদিও এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া চাই না, তবু সহ্য করতে হয় আমাকে।

ভিক্টর আসবেনা? মার্গারেট বলে উঠল। আমি বললাম, ডরোথি আসার সময় আমাকে বলল যে একটু পরেই ও আসবে। মার্গারেট হেসে বলল, বড় মজার ছেলে এই ভিক্টর, ওর সব কথাবার্তা শুনলে আমার ভীষণ হাসি পায়।

যেমন বল ওর একটা কথা, আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মার্গারেট জবাব দিল, ফ্রেডির বইটা পড়ে ওর খুব ভালো লেগেছে, তাই ও বলছে যে ও বড় হয়ে ফ্রেডির মত লেখক হবে। মার্গারেট একটু থেমে বলল, ওর সঙ্গে আলাপ হবে কি করে, আমি অবশ্য এ কথা বলেছি, যদি ও এখানে আসে তাহলে আলাপ হয়তো হতে পারে। মার্গারেট আমার চোখের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমাকে ও পরখ করতে চাইছে বলে মনে হলো। আমার কি রকম অবস্থা হয় ফ্রেডির কথা বললে সেটা জানাই যেন ওর উদ্দেশ্য। ফ্রেডির কথা একেবারেই আমি সহ্য করতে পারছি না। একদম যেন আগুন জ্বলছে আমার মাথায়। আমার হাত আস্তে আস্তে উঠে এল মার্গারেটের মাথার উপর থেকে। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেও পারলাম না রাখতে। ভেতর থেকে উঠে আসছিল আমার এক ধরণের রফা।

মৃদু হেসে বললাম, তোমার খুব ভাল লাগে না ফ্রেডিকে?

হেসে বলল মার্গারেট, আমার ভালগার কথা আমি বলি নি, ভিক্টরের ভালো লাগে ওকে এই কথাই আমি বলেছি।

আমি চেষ্টা করলাম ওর কাছ থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতে। যাকে আমি প্রাণপণে ভালবাসি, সে কিনা অন্য পুরুষের চিন্তায় বিভোর হয়ে আমার সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে শুধু এক অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব গর্ভে নিয়ে। ওর প্রতিশোধ আমি নেবোই, ছেড়ে আমি দেবো না ওকে। ও অসুস্থ তাই এই মুহূর্তে কিছু বলবনা, ওর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া আমি করব ও বাড়িতে ফিরে আসলে। ও বললো, আমি খেতে পারছি না, কেন যে আমার শরীর বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এরপর উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো, আমি মাকে কাল স্বপ্ন দেখেছি জানো।

হ্যারিয়টকে দেখেছো!

মা, এখনতো উনিই আমার মা, মার্গারেট বললো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, স্বপ্নে কিরকম দেখলে ওকে?

মার্গারেট বলল, পাগলের মতো হয়ে গেছে মা, পাহাড়ের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল ধাক্কা মেরে। মা পাগলের মতো হাসছিল আমি পড়তে পড়তে যত চীৎকার করছিলাম। ঘুমটা ভেঙে গেল তারপরই।

আমি বললাম, স্বপ্নটা খুব মজার না, তারপর কি হল?

মার্গারেট জবাব দিল, একটি চিল এসে আমাকে ছোঁ মেরে কোথা থেকে নিয়ে তারপর মিলিয়ে গেল, সেই চিলের মুখটা মানুষের। যখন আমি ওকে তুলে নিয়ে গেলাম তখনই বুঝতে পারলাম, সেই মানুষটা কে।

তখনই আমি বললাম, ফ্রেডি উইলসন কি?

মার্গারেট খিলখিল করে হেসে বললো, না, সেই মানুষটা তুমি।

ওর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে কিছু বলার আগেই ভিক্টর তার মা ডরোথির সঙ্গে ঘরের পর্দা সরিয়ে ঢুকল এবং আমার দিকে তাকিয়ে ডরোথি হেসে তারপর মার্গারেটকে জিজ্ঞেস করলো, মিমি, এখন কেমন লাগছে তোমার?

মার্গারেট মৃদু হেসে বলল, আমার খুব ভাল লাগছে।

আমাকে জিজ্ঞেস করলো ডরোথি, মিঃ ব্রাউন আপনি কখন এসেছেন?

আমি মৃদু হেসে বললাম, এই কিছুক্ষণ আগে।

মার্গারেটের কাছে এগিয়ে একটি চেয়ারে বসে ভিক্টর বলল, তোমাকে নিয়ে আমি একটা গল্প লিখব ভাবছি।

ভিক্টর আবার পাগলামি করছো, মার্গারেট একটা ধমক দিয়ে বলল।

ভিক্টর হাসতেই তার মনে পড়ল যে আমি আছি, তাই সে চুপ করে গেল।

আমি বললাম, তোমরা গল্প করো, মার্গারেট আমি যাচ্ছি, সময় হয়ে আসছে, ঘড়িতে দেখলাম। ভিক্টরকে বেরিয়ে আসার আগে বললাম, তুমি আমার সঙ্গে একবার দেখা করো ভিক্টর।

ভিক্টর জবাব দিল, ঠিক আছে। বেরিয়ে এলাম আমি নার্সিংহোম ছেড়ে। ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে আমার মনের মধ্যে। বাড়িতে ফিরতে অনেক রাত হল কারণ একটা বারে আকণ্ঠ মদ গিলে ফিরলাম। ফ্রেডির মুখটা মনে পড়তে একটা অশ্রাব্য খিস্তি দিলাম। বিছানার উপর এলিয়ে দিলাম এরপর ক্লান্ত দেহটাকে।

.

২৫.

মার্গারেটের চলাফেরা মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে কারণ এখন ও মোটামুটি সুস্থ। দিন কয়েক বিছানায় শোয়ার পর এখন ও আবার চলাফেরা করছে। ওর পেটটা সামান্য স্ফীত হয়েছে। বারান্দায় বসেছিলাম এবং আমি ভাবলাম যে মার্গারেটকে এবার সবকিছু বলা দরকার। কিছুক্ষণ আগে চা দিয়ে গেছে ডরোথি এবং রীতিমতো আগুন জ্বলছে এখন আমার মাথার মধ্যে। আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না যতক্ষণ না এর ফয়সলা হচ্ছে। আমার মুখোমুখি এসে মার্গারেট বসলো স্নান সেরে। বাদামী রঙের ড্রেসিং গাউন পরনে এবং দারুণ ফর্সা শরীরে সুন্দরী লাগছে ওকে। চোখদুটো ফোলাফোলা, ভালো ঘুমিয়েছে রাতে। আমি একবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে মুখটা ওর গম্ভীর। টেবিল থেকে টেনে নিয়ে কাগজ পড়তে লাগলাম আমি। আমি চুপচাপ চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ কেটে গেল। কালেই গরমের আভাস এবং রোদ ঝলমল করছে সারা জায়গায়। অনেক দুরে মেঘ জমেছে এবং অদ্ভুত পরিবেশ। শেষ বোঝাপড়া করা আমার দরকার মিমির সঙ্গে। আমি বললাম, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে মিমি।

খবরের কাগজ থেকে ও চোখ দুটো তুলে তাকাল আমার দিকে। ভুরু দুটো কুঁচকে তাকাল, আমি ওর দিকে তাকাতে ও আমার গম্ভীর চোখ দেখে সম্ভবতঃ একটু ভয় পেয়ে গেলো। কি কথা, মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো ও।

কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর বললাম, তোমার পেটে বাচ্চা এসেছে মার্গারেট।

মার্গারেট চমকে উঠল, কি বললে!

আমি আবার বললাম, এখন তুমি সন্তানসম্ভবা।

মার্গারেট বলল, আমার পেটে বাচ্চা, টেবিলের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়ে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল ও। আমার ওর গায়ে হাত দিতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা করছিল না। তাই আমি চুপ করে রইলাম, মার্গারেট বিশ্বাসঘাতিনী, আমার প্রেমের মর্যাদা ও রাখেনি। ও বিলিয়ে দিয়েছে ওর নিজের দেহটাকে অন্য এক পুরুষকে। ক্ষমা আমি কেমন করে করবো ওকে। ও মিশে আছে আমার দেহের প্রতিটি অনুপরমানুতে। আমি ওকে ছাড়তে পারব না। ওর সত্তা জড়িয়ে গেছে আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে। ও আমারই প্রেমিকা ও শত অপরাধ করুক না কেন। মার্গারেট মুখে একটা কাঠিন্য নিয়ে শান্ত হলো বেশ কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর।

তিনমাস আগে তোমার পেটে বাচ্চা এসেছে, মার্গারেট এবং আমি বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর, নিস্তব্ধতা ভাঙলাম আমি। এবার আমাকে বলল, এ বাচ্চা কার, আমি আরো গভীর এবং কঠিন স্বরে বললাম।

কোনোরকম জবাব না দিয়ে চুপ করে মাথা নীচু করে রইল মার্গারেট। ভেসে আসছিল ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর পাশের বাড়ি থেকে। মিমি এ বাচ্চা কার, বলল আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

মার্গারেট মুখটা কঠিন করে নীচু করে থাকাতে আমি আবার বললাম, এ বাচ্চা কার বলো?

মার্গারেট চমকে বলল, আমি জানি না।

তুমি একটা পাকা অভিনেত্রী, তুমি জানো নিশ্চয়, তুমি আঘাত করেছ আমার বিশ্বাসে, তুমি আমার ভালবাসার মর্যাদা দাওনি বিশ্বাসঘাতিনী, আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম পাগলের মত এবাচ্চা কার বলল।

মার্গারেট জবাব দিল একই ভাবে, জানিনা বললাম তো। একটা থাপ্পড় কলাম সজোরে ওর গালে। ওর চোখ দুটো বিস্ফোরিত হয়ে জলে ভরে গেছে এবং ও সঙ্গে সঙ্গে একটা গালে হাত দিয়ে আমার দিকে তাকালো। ঘরের ভিতর ও দৌড়ে চলে যেতে ওর পেছন পেছন আমি ঘরের ভেতরে ঢুকলাম। ফুলে ফুলে কাঁদছে দেখলাম মার্গারেট, বিছানায় উপুড় হয়ে। আমার মাথা আরো গরম হয়ে উঠল ওর এই কান্নার আওয়াজ শুনে। আমি ওকে বসিয়ে দিলাম চুলের মুঠি ধরে। বললাম দাঁতে দাঁত চেপে, এ বাচ্চা কার তোমাকে বলতে হবে।

মার্গারেট একইভাবে কঠিন স্বরে বলল, আমি জানি না।

চীৎকার করে বললাম আমি চুলের মুঠিটা শক্ত করে ধরে, বাঃ চমৎকার। তুমি নিজে পেটে তিনমাসের বাচ্চা ধরে আছ আর তুমি জানো না। তোমাকে বলতেই হবে এ বাচ্চা কার। আমি তোমাকে শেষ করে দেব তা না হলে।

মার্গারেট এখন আর কাঁদছে না, এখন ওর জেদী ভাবটা ক্রমশঃ বাড়ছে। রীতিমতো কঠিন হয়ে উঠছে এখন ওর চোখ মুখ। মার্গারেট জোর দিয়ে বলে উঠল, তুমি তো আমাকে মেরে ফেলতে পারবে না।

কার বাচ্চা, এই বলে আমি আবার ওর চুল ধরে ঝাঁকুনি দিলাম।

জানি না, মার্গারেট বলল।

মার্গারেট মুখ নীচু করে বসে রইল এবং ওর চুল ছেড়ে দিলাম আমি। আমি বললাম চেয়ারে বসে, আমি জানি, আমি যদি বলি।

আমার দিকে মার্গারেট তাকালো খানিকটা অবাক হয়ে। তারপরই গম্ভীর হয়ে গেল ও। মার্গারেটের দিকে আমি তাকালাম এবং আমি কেননা ব্যাপারটা ভাবতে পারছি না ওকে শেষ করে দিই বা আমি নিজে আত্মঘাতী হই এটাই আমার মনে হল কারণ আমার মাথায় এখন আগুন জ্বলছিল। আমি নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করলাম যতটা পারা যায়, চুপচাপ একই ভাবে বসে রইল মার্গারেট। তারপর বেশ খানিকটা সময় কেটে যাবার পর আমি বললাম, আমি জানি এ বাচ্চা কার মার্গারেট, আমি বোঝাপড়া করব তার সঙ্গে পড়ে। আমি তোমাকে ভালবাসি মিমি। আমি ভাবিনি যে শেষপর্যন্ত তোমার কাছ থেকে আমি এতটা আঘাত পাব।

মার্গারেট চুপচাপ একইভাবে বসে রইলো এবং আমিও থেমে গেলাম। মার্গারেট আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছিল বলে আমার মনে হচ্ছিল। ওর চোখে একটা প্রচণ্ড জেদী ভাব দেখলাম আমি। আমি এর আগে দেখিনি ওর মুখে এই ধরনের কাঠিন্য।

আমার সেই ছোট্ট সরল প্রিয়তমা মিমি আমার কাছ থেকে ক্রমশঃ অপরিচিত হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। চুপচাপ মার্গারেট খানিকক্ষণ বসে রইল এবং তারপর আমি বললাম, শোনো মিমি, তুমি না বললেও আমি জানি এ বাচ্চা কার, পরে তার সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করব। আমি তোমাকে ভালবাসি মিমি, তোমার কাছ থেকে যে এরকম আঘাত আসবে তা আমি ভাবিনি মিমি।

মার্গারেট চুপচাপ একইভাবে বসে রইলো এবং আমিও থেমে গেলাম। মার্গারেট আমার কাছ থেকে অনেকদূরে সরে যাচ্ছিল বলে আমার মনে হচ্ছিল। ওর চোখে একটা প্রচণ্ড জেদী ভাব দেখলাম আমি। আমি এর আগে ওর মুখে এই ধরনের কাঠিন্য দেখিনি। আমার সেই ছোট্ট সরল প্রিয়তমা মিমি আমার কাছ থেকে ক্রমশঃ অপরিচিত হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। একবারেই আমি জানিনা এই মার্গারেটকে। আমার নেই ওর সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচয়। পোষাক এলোমেলো ভাবে মার্গারেট বসে আছে গম্ভীর হয়ে এবং দেখা যাচ্ছে ওর বুকের অনেকটাই। আমার চোখের সামনে সে বসে আছে নিরেট পাথরের মূর্তির মত। আমি বারান্দায় চলে এলাম ঘর থেকে বেরিয়ে। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চলছে যে আমার সেসব কোনোদিকেই নজর নেই। আমি আবার ঘরে ঢুকলাম কিছুক্ষণ বারান্দায় কাটিয়ে। এবং তখন ও একভাবে বসে আছে দেখলাম। আমি পড়তে পারলাম না ওর দুচোখের ভাষা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ভেতর ভেতর ও তীব্রভাবে অনমনীয় হয়ে উঠেছে। আমার মনে হল যে এই মুহূর্তে আমার একটু বাইরে যাওয়া দরকার এবং সেই কারণেই আমি পোষাক পরলাম। আমার এখন মুক্তির দরকার, আমি বেরিয়ে এলাম দ্রুত পায়ে ঘর থেকে এবং হাঁটতে লাগলাম রাস্তার উপর দিয়ে। ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে আমার এই মুহূর্তে। ভেতর ভেতর একটি অস্থিরতা বোধ করছি বলে ভালো লাগছে না কিছুই। এমনকি নিজেকেও না।

এর আগে কখনো আসেনি আমার নিজের ওপর এত বিতৃষ্ণা। বারের একটি কোণের টেবিলে সোজা এসে বসলাম। এর আগেও আমি এখানে এসেছি বেয়ারা আমাকে চিনতে পেরেছে। বেয়ারা আমার কাছে মৃদু হেসে দাঁড়াতেই আমি হুইস্কির অর্ডার দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে টেবিলের ওপর এক গ্লাস হুইস্কি বেয়ারা রেখে গেল। এলোমেলো দেখাচ্ছিল বলে আমাকে বারের ম্যানেজার জিজ্ঞেস করলে আপনার শরীর কি খারাপ স্যার?

আমার কিছুই হয়নি, আমি ঠিক আছি। মৃদু হেসে জবাব দিলাম আমি হাত নেড়ে।

আমার সামনে থেকে কিছু না বলে চলে গেল ম্যানেজার ভদ্রলোক। আমি জানি না ঘণ্টা দুয়েক কোথা দিয়ে চলে গেল। ঘোড়ার গাড়ি করলাম শেষ পর্যন্ত বার থেকে বেরিয়ে। এখন কোথায় যাওয়া যেতে পারে কারণ একেবারেই যেতে ইচ্ছা করছে না বাড়ি। হাল্কা লাগছে পা দুটো তাই জড়ানো গলায় কোচোয়ানকে বললাম, পার্কে যেতে চাই আমি। সে, দু–একবার বোঝাতে শেষ পর্যন্ত বুঝল। পার্কে গিয়ে দেখলাম জোড়ায় জোড়ায় সব নারী পুরুষ বসে আছে। একটি জলাশয়ের সামনে বসে আছি, যাতে ঢেউ উঠছে মৃদু। জলাশয়ের পাশের বেঞ্চিতে একভাবে খানিকক্ষণ বসার পর আমার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ল। ও কিরকম উচ্ছল স্বভাবের ছিল যখন আমার সঙ্গে মার্গারেটের প্রথম দেখা হয়েছিল। এখন সে রুক্ষ এবং জেদী, ওর মধ্যে উচ্ছলতার কোনো অবশিষ্ট নেই তাই রীতিমতো কঠিন ওর মনের তল পাওয়া। একটু একটু করে মার্গারেট দূরে সরে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে। আমি একভাবে বসে রইলাম সেই জলের মৃদু ঢেউ-এর দিকে তাকিয়ে। ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসছে দুপুর। এখানে প্রেম প্রত্যাশী নারী। পুরুষের ভিড়

বেড়ে যাবে যতই রোদ কমে আসবে। একসময় ফাঁকা পরিবেশে এক মহিলা যা পরনে উগ্র ধরনের পোষাক সে এসে বসলো। ও বসলো দূরত্ব বজায় রেখেই। ওকে বোঝা যাচ্ছি। বেশ্যা হিসাবে; কারণ আমার ভালো লাগছিল না ওর চাউনিটা। একটু গম্ভীর হয়ে আমি ও দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি যাও, এখন কোনো আগ্রহ নেই আমার।

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো বসে মহিলাটি। এই দুপুরে খদ্দের ধরতে বেরিয়েছ, তোমার বি টাকার দরকার খুব? আমি বলে উঠলাম অসহিষ্ণুভাবে।

মহিলাটি রুক্ষ স্বরে বলল, আমি কি এমনি বেরোই টাকার দরকার না হলে। উগ্র পেন্ট কর মুখ, তাকিয়ে দেখলাম। তাতেও বয়সের প চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। একরাশ কালো অন্ধকা চোখের নীচে। বাদামী রঙের স্কার্ট পরনে এবং লালচে চুল। দুটি বুক বাঁধা আঁটোসাটো করে এব ভীষণ উঁচু হয়ে আছে স্কার্টের উপর দিয়ে। রঙ বাদামী, ফর্সা বা কালো নয়।

তোমার কত টাকার দরকার, আমি বললাম জড়ানো কণ্ঠে।

মহিলাটি ঠোঁট উল্টে ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, এমনি কি দেবে নাকি তুমি।

পকেট থেকে পার্স নিয়ে আমি পঞ্চাশটা টাকা বের করলাম এবং এগিয়ে ধরে বললাম, তুটি এখান থেকে চলে যাও এটা নিয়ে।

তীব্রভাবে রেগে মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়ে আমার মুখের সামনে খানিকটা এগিয়ে এসে তী শ্লেষের সঙ্গে মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল, আমায় টাকার লোভ দেখাচ্ছ বদমাইশ, আমি

ভিখারী আমার ফ্ল্যাটে ফাইফরমাশ খাটছে তোমার মতো লোক। দুহাতে স্কার্টটা উঁচু করে তুলে বলল শুয়োর কোথাকার, আমি আমার দেহকে খাটিয়ে রোজগার করি।

মহিলাটি এই কথা বলে দ্রুত পায়ে গট গটিয়ে চলে গেল। আমার কানে ভেসে এল এরপর শিসের শব্দ এবং মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বসে রইলাম হতভম্ব হয়ে।

বাড়িতে ফিরে এলাম সন্ধ্যে নামার আগে এবং উঁকি মারলাম এসেই ড্রয়িং রুমে। দেখলাম

ড্রয়িংরুমের দরজা ভেজানো এবং সেখানে মার্গারেট এবং ভিক্টর অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে নীচু স্বরে কথাবার্তা বলছে। দুজনেই সামান্য চমকে উঠল আমাকে দেখে এবং মার্গারেটকে গম্ভীর স্বরে আমি বললাম, এক্ষুনি আমার ঘরে এস।

আমি যে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ এবং এলোমেলো সেটা ভিক্টরের নজর এড়ায়নি এবং সেই কারণেই সে আমার দিকে তাকিয়েছিল। ভিক্টরের দিকে আমি তাকিয়ে বললাম, আমার এখন একটু দরকার আছে ভিক্টর, তুমি বাড়ি যাও।

ভিক্টর আগে এরকম অবস্থায় আমাকে দেখেনি কখনও তাই ওর পক্ষে ঘাবড়ে যাওয়াটা বিচিত্র নয়। দরজার দিকে ও উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালো আমার কথা শোনামাত্রই। আমি ওকে বললাম দরজার সামনে আসতেই, আমার সঙ্গে কাল একবার তুমি দেখা করবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ঘাড় নাড়িয়ে ভিক্টর এবং আমি ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ কিছুক্ষণ। আমি ওপরে আছি, এসো তাড়াতাড়ি, আমি মার্গারেটকে বললাম।

মার্গারেট মুখ নীচু অবস্থাতেই বলল, যাচ্ছি।

আমার. নেশা অনেকটা কেটে গেলেও একেবারে যায়নি, সেই কারণে আমার পা টলটল করছিল এবং তাই আমি ওপরে চলে এলাম। চোখ দুটো বুজে ঘরে গিয়ে দেহটাকে এলিয়ে দিলাম বিছানার উপরে। চোখ খুলে হঠাৎ দেখলাম ডরোথি দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। আমি তাকে আসতে বললাম ভেতরে এক ডরোথি ঢুকে একটা চেয়ারে বসলো। আপনার কি শরীর খারাপ সে বলল।

আমি বললাম মৃদু হেসে, আমি লাঞ্চ খাইনি যদিও অবশ্য ডিনারও করবো না। কিন্তু আমার শরীর খারাপ নয়।

ডরোথি কি বলবে ভেবে না পেয়ে একটু অবাক হলো। আমি চোখ দুটো বুজে টান টান হয়ে শুয়ে রইলাম এবং ঘাড় নাড়িয়ে খানিকক্ষণ বসে বেরিয়ে গেল ও। পায়ের আওয়াজে চোখ খুলে দেখলাম যে মার্গারেট দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর চেহারা একেবারে অন্য রকম হয়ে গেছে, কোনোরকম উজ্জ্বলতা অবশিষ্ট নেই এবং দু-চোখের কোণে কালি এবং পেটটা সামান্য উঁচু। চোখ দুটো রুক্ষ

কি ব্যাপার, আমার সামনে চেয়ারে বসে ভুরু কুঁচকে ও বলল।

ওর অনেক বয়েস হয়েছে বলে এই মুহূর্তে আমার মনে হল। ওর যেন কোনো প্রেম ভালবাসার অবশিষ্ট নেই আমার উপরে। ওকে পেয়ে বসেছে কাঠিন্য। তাই আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি খুবই দুঃখিত মিমি তোমার গায়ে হাত তোলার জন্য। একটু থামলাম কিন্তু কোনো জবাব দিল না মার্গারেট। তুমি ভিক্টরকে কি বলছিলে, আমি বললাম।

তোমার কোনো অধিকার নেই তা জানার, মার্গারেট চোখ দুটো কঠিন করে বলল।

আমি যদিও আহত হলাম কিন্তু বললাম স্বাভাবিক ভাবে, আমার কোনো অধিকার নেই তা জানার এই কথা বলছ কেন?

আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নই এবং তুমি আমার মাকে মিথ্যা কথা বলে আমাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছ।

আমি বললাম, তুমি প্রতিবাদ করনি তো?

মার্গারেট বলল, আমি তোমাকে তখন বিশ্বাস করতাম তাই।

মার্গারেটকে আমি আর্তস্বরে বললাম, কেন ভালবাসতে না?

মার্গারেট আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নীচু করে বলল, আমি তা বলতে পারবো না তবে এখন আর বাসি না।

আমি ঢোক গিললাম এবং একটা গরম রক্তের স্রোত বয়ে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। আমার মাথা গরম হয়ে গেলেও নিজেকে স্বাভাবিক রেখে বললাম, আমি তোমাকে ভালবাসি মার্গারেট, তাই আমি তোমাকে ছেড়ে একমুহূর্তও থাকতে পারবো না, আমি অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছি তোমার জন্য। একটানা কথাগুলো বলে আমি থামলাম কিছুক্ষণের জন্য। তোমার বাচ্চাকে নষ্ট করতে হবে মার্গারেট।

মার্গারেট আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল, না।

আমি বললাম, কেন তুমি করবে না, কেন?

না, বাচ্চা আমি নষ্ট করবো না।

এই অবৈধ সন্তান তুমি পেটে ধরবে। আমি অবাক হয়ে বললাম।

সন্তান অবৈধ বলে আমি মনে করি না।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, এতোদূর এগিয়ে গেছ তুমি। আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে দুহাতে ওর মাথাটা তুলে ধরে বললাম, কি বলছো ভেবে দেখ তুমি মার্গারেট।

স্থির ভাবে বলল মার্গারেট, এ সন্তান আমার, আমি তো বারবার বলছি।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওকে ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় গেলাম ঘর ছেড়ে। আমার নিজেকে কোনোদিন এতোখানি নিঃস্ব মনে হয়নি। দেখলাম অন্ধকার ক্রমশঃ ঘন হয়ে আসছে বাইরে।

.

২৬.

সকাল থেকে মার্গারেটকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিছানায় ঘুম থেকে উঠে ওকে দেখতে না পেয়ে ভেবেছিলাম বাথরুমে। তাই সেখানে গেলাম কিন্তু সেখানেও না পেয়ে আমি তোলপাড় করে ফেললাম সারা জায়গা। ডরোথিকে জিজ্ঞেস করলেও ও কিছুই বলতে পারলো না। ডরোথিকে ভিক্টর-এর কথা জিজ্ঞেস করতে ও জানালো যে, ভিক্টরের ফিরতে দেরী হবে কারণ ও কলেজে গেছে। কোথায় যেতে পারে মার্গারেট। আমি ভাবতে পারিনি ঘুণাক্ষরেও যে শেষ পর্যন্ত ও পালিয়ে যাবে। আমার মাথায় কিছুই আসছিল না, তাই মার্গারেটকে কোথায় পাওয়া যাবে এই ভেবে বিভিন্ন পার্ক এবং রাস্তাঘাট এলোমলোভাবে তল্লাশি করলাম। কিন্তু পেলাম না কোথাও। সব কিছু খুঁজলাম ঘরের মধ্যে তোলপাড় করে, যেমনকার পোষাক তেমনই আছে তার। মানে সেটা পরেই ও বেরিয়ে গেছে যেটা পরে ছিল। মেঝেতে হঠাৎ একটা ফোটো ছিটকে পড়তে দেখি ফ্রেডির ফোটো। ফ্রেডি হাসছে চশমার ভিতর দিয়ে এবং অদ্ভুত রকমের সুন্দর লাগছে ওকে। কুচি কুচি করে ছবিটা ছিঁড়ে আমি সেটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বললাম, বিশ্বাসঘাতক, শুয়োরের বাচ্চা। রাস্তায় উড়ে পড়তে লাগলো টুকরো টুকরো কাগজগুলো। দুহাত দিয়ে নিজের চুলগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে অসহায় আক্রোশে ঘরের মধ্যে পায়চারী

করতে লাগলাম। সজোরে একটা লাথি মারলাম মার্গারেটের বাক্সটা পায়ে লাগতে। শেষ পর্যন্ত চেয়ারে বসে ক্লান্ত হয়ে ভাবতে লাগলাম, আমার প্রিয়তমা কোথায় গেল? আমার নিজেকে অস্থির লাগছে প্রচণ্ড কারণ প্রতিটি অণুপরমাণুর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে মার্গারেট। ডরোথি আমাকে দেখে কিরকম যেন ভয় পেয়ে গেল আমার জন্য চা নিয়ে এসে। ও চলে যাচ্ছিল চায়ের কাপটা রেখে। আমি ওর হাত চেপে ধরে বললাম, তোমরা নিশ্চয় জানো ডরোথি মিমি কোথায়, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তোমরা।

ও কাতরকণ্ঠে বললো, আমি কিছুই জানি না মিঃ ব্রাউন, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন।

সব জানো আলবাৎ জানো বেইমান।

ডরোথিকে পাঁজাকোলা করে ঘরে নিয়ে এসে বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, ও ভয়ে আঁতকে বলল, ছেড়ে দিন আমাকে, ছেড়ে দিন।

আমি সজোরে থাপ্পড় মারলাম কারণ আমার মাথা দিয়ে তখন আগুন ছুটছিল, বলল মার্গারেট কোথায়, আমি বললাম।

আমি জানি না বিশ্বাস করুন।

ডরোথি কেঁদে উঠল এবং আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে একটানে ডরেথির স্কার্টটা খুলে দিলাম। তারপর একটু একটু করে নিংড়ে নিতে লাগলাম ওর অসুন্দর এবং শিথিল শরীরটাকে। ও মাঝে মাঝে আর্তনাদ করছিল, আমি ওকে বললাম, সব যখন শেষ হয়ে

গেল, এখন যাও। তোমার পরিণাম খুব খারাপ হবে বাইরে যদি প্রকাশ কর। খুন করে ফেলব তোমাকে এবং ভিক্টরকে আমি ছাড়বো না।

আমি খিল দিয়ে দিলাম ও টলমল করতে করতে বাইরে চলে যেতেই।

একইভাবে কেটেছে আমার দিন সাতেক। ডরোথি এবং ভিক্টরকে সেই থেকে আর দেখিনি। খুঁজে বেড়িয়েছি বিভিন্ন জায়গা তোলপাড় করে ওকে পথে–ঘাটে, রেস্তোরাঁয়, পার্কে খুঁজে বেরিয়েছি। মার্গারেট হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে তাই ওকে কোথাও পাওয়া যায়নি।

একেবারেই চেনে না মার্গারেট কলকাতার রাস্তাঘাট। মায়ের কাছে ও বোম্বেতে ফিরে যায়নি তো, হঠাৎ একবার আমার মনে হল। ও অবশ্য টাকাপয়সা পাবে কোথায়, তাই আমার মাথায় কোনো ব্যাপারটাই ঢুকছে না ঠিক মতো।

ডরোথির ওখানে আমার আর যেতে ইচ্ছে করছে না বলে এখন আমাকে হোটেলে খেতে হচ্ছে কারণ খাওয়াটা আমার ঠিক হবে না।

আমার ক্ষমতা নেই মার্গারেটের নিরুদ্দেশের ব্যাপারটা থানায় জানানোর। অগত্যা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভেসে চলে যেতে লাগলাম হালভাঙা নৌকার মতো। সারাদিন ঘুরি কেবলমাত্র রাতে ফিরি। সকালে সেই যে স্নান সেরে বেরোই, গভীর রাতে ঢুকি পা দুটো টলমল করে নেশায়। আমাকে তলার ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যায় কোচোয়ান যার গাড়ি চড়ে আমি ফিরি। ভয়ে আঁতকে উঠি মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে। আমার নিষিদ্ধ পল্লীতে আসা যাওয়া বেড়ে গেছে। একদিন রাতে একটি বিশ্রী স্বপ্নে দেখলাম যে খাদের

কিনারায় আমাকে চুলের মুঠি ধরে বসিয়েছে মিসেস হ্যারিয়েট মুর। আমার তলপেটে একটা ছুরি বসানো এবং পা দুটো ছটফট করছে। দুটো কিম্ভুত কিমাকার লোক হারিয়েটের পাশে। প্রথমে দোলাতে আরম্ভ করল চুলের মুঠি ধরে হ্যারিয়েট এবং তারপরে অতল খাদের নীচে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল কিম্ভুত কিমাকার লোকদুটো।

আমার সারা কপাল ঘামে ভিজে গেছে। আমি চীৎকার করে উঠেছি। পাখা ফুল স্পীডে বাড়ালাম এবং আলো জ্বালোম। আমি ঘামছি। হাঁফাতে লাগলাম উঠে বসে খানিকক্ষণ। কয়েক গ্লাস জল খেলাম ঢক ঢক করে। দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেলেও আরেকটা খেলাম। বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম আলো নিভিয়ে এবং তারপর জানিনা কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি। একবার মনে হল যেন ভোর হয়ে গেছে।

ঘড়ি দেখলাম বেশ বেলা হয়েছে। ঘুম ভেঙেছে দরজার ঠক্ঠক্ শব্দে। দরজা খুলে যাকে দেখলাম আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম তাকে দেখে। হাতে ব্যটন নিয়ে বিরাট চেহারার একজন পুলিশ অফিসার। আমার পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে একটি ঠাণ্ডা রক্তের স্রোত বয়ে গেল ওর গোঁফজোড়ার দিকে তাকিয়ে। দুজন ভয়ঙ্কর চেহারার কনস্টেবল পাশে। একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি হেসে অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ পিটার ব্রাউন আপনি না?

আমি ঘাড় নাড়লাম, মৃদু হেসে অফিসার বললেন, আমি খুবই দুঃখিত আপনাকে বিব্রত করার জন্য, একবার থানায় যেতে হবে আপনাকে আমার সঙ্গে।

গম্ভীর মুখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার অপরাধ কি? আমার কণ্ঠস্বরে কোনরকম তীব্রতা ছিল না যেহেতু আমি জানি যে আমি কতবড়ো অপরাধী।

পুলিশ অফিসার বললেন, আমি কিছু জানি না, আপনি সেই সব জানবেন থানায় গেলেই।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম আমি ধীরে ধীরে এখানকার রোদ গায়ে মেখে। বাড়ির দরজায় তালা দিলাম, দেখলাম এক প্রতিবেশী দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন বাড়ির মালিককে চাবিটা দিয়ে দেয়, এই কথা তাকে বলে আমার মনে হল যেন এই যাওয়াই শেষ যাওয়া আমার। পুলিশ ভ্যানের ভিতর আমি ঢুকে বসতে থানার দিকে তা এগিয়ে চলল নিঃশব্দে।

.

২৭.

শেষ পর্যন্ত জেল হয়ে গেছে পিটার ব্রাউনের। সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে আদালত ওকে দশ বছরের জন্য। পিটার হেরে গেল প্রতিবারই জীবনের বাস্তব খেলায় ভুল চাল দিয়ে। পিটারের ঘুমন্ত যৌবনকে জাগিয়ে দিয়েছিল জীবনের প্রারম্ভে যে কিশোরী এসেছিল। কিন্তু তার আশ মেটেনি এবং শেষ পর্যন্ত আশ মিটেছিল অনেকদিন পর স্ত্রীর সান্নিধ্যে। সে স্ত্রীকেও বেঁধে রাখতে পারেনি কারণ দেহ সর্বস্ব নারী পালিয়েছিল অন্য পুরুষের সঙ্গে। প্রেমের সন্ধানে তারপর দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়িয়েছে পিটার। এমন কথা সত্যি নয় যে তার জীবনে বিভিন্ন নারীর সান্নিধ্য আসেনি। দেহের চাহিদা তার ক্রমশঃ

বেড়েছে এবং কিছুতেই তার তৃপ্তি মেটেনি। অষ্টাদশী মানসপ্রিয়াকে সে খুঁজে পেয়েছে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। সেই কিশোরী প্রেমিকার কথা তাকে দেখামাত্রই মনে পড়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত এক অনুভূতিমাখা স্বাদের সন্ধান দিয়েছিল সে তাকে প্রথম। প্রেমের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার ভুল চাল দিল হার্টস্পেশালিস্টপিটার। মার্গারেটের দিকে তাকে টেনে নিয়ে গেল তার আকণ্ঠ দেহ পিপাসা। মার্গারেট তন্বী যৌবনা একটি স্বভাব চঞ্চল বালিকা। পবিত্রতা চোখের চাহনিতে এবং কুসুমের মত দেহ তার পাগল করে তুলেছিল পিটারকে। সে সবকিছু ভুলে মেতে উঠেছিল দৈহিক খেলায়। দৈহিক উন্মাদনার বীজ লুকিয়েছিল পিটারের পূর্বপুরুষের রক্তে। পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন পিটারের দাদু একের পর এক নারী সম্ভোগে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে। প্রচুর সম্পত্তি ছিল তার। সেই উন্মাদনা সংক্রামিত হয়েছিল পিটারের বাবার দেহেও। শুধু বোনকে পাবার আশাতেই ভদ্রলোক প্রথম স্ত্রীকে খুনই করেছিলেন একরকম। বোনকে পাননি তিনি। পিটার তো তারই সন্তান। ভারতীয় ছিলেন পিটারের মা। এবং উজ্জ্বল স্বভাবের ছিলেন পিটারের বাবা। তার ছিল একটিমাত্র হোটেল লন্ডনে, সবকিছু খুইয়ে এইটিই ছিল তার সম্বল। ভারতে এসে বোম্বেতে একটি ছোটোখাটো হোটেল খুলেছিলেন ভাগ্য ফেরাবার আশায়।

ততদিনে পিটার শেষ করেছে ডাক্তারী পড়াশুনো। পিটার ভদ্রলোক হয়েছে ইতিমধ্যে রীতিমত। খুবই বিরল এমন অমায়িক স্বভাবের মানুষ। মারাত্মক খেলায় শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ল পিটার। অস্বীকার করা যায় না রক্তের প্রভাব। ক্রমশঃ মারাত্মক ফাঁদের দিকে পিটারকে নিয়ে চলল পিটারের ভাগ্য। সুদূর বোম্বেতে এক কারাগারে পিটার তারই চরম পরিণতিতে জনৈক মিসেস হ্যারিয়েট মুরের হত্যার জন্য দায়ী সে–এটাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ।

একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল মার্গারেটের একমাত্র অভিভাবক হ্যারিয়েট আত্মহত্যা করার আগে। হ্যারিয়েট এবং মার্গারেট এই দুজনকে ও প্রতারণা করেছে একই সঙ্গে। ওদের বাড়িতে ভাড়া থাকতো পিটার এবং মেলামেশার সূত্রে হ্যারিয়েটের খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। ও ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে পিটার ওর মৃতা বোনের মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। ওর চোখে ধরা পড়েছিল অবশ্য মার্গারেটের পরিবর্তন।

ব্যাপারটাকে তা সত্ত্বেও ও গুরুত্ব দেয়নি। তার ফলে এই ব্যাপারটা ওর পক্ষে কাল হয়েছিল। ও মার্গারেটকে নিয়ে পালিয়েছিল এক পরিচালক বন্ধুর ফিল্মে নামিয়ে দেবার নাম করে। এই মিথ্যাচার মার্গারেটও বুঝতে পারেনি প্রথমটা। হ্যারিয়েটের সন্দেহ হয়েছিল যখন মাসখানেক পরেও ওরা ফিরলো না এবং ভীষণ আঘাত পেয়েছিল তখন ও। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজিও করলো। ওকে বেশ কয়েকমাস হাসপাতালে কাটাতে হলো তারপরই। নিজের মেয়ে যদিও নয় তবু মার্গারেটকে ও ভালবাসতো নিজের মেয়ের মত। হ্যারিয়েট সেরে ওঠার পর একদিন বাড়িতে ফিরে খুঁজে পেল হঠাৎই মার্গারেটের সেই ডায়েরী। হুবহু লেখা ছিল এতে মার্গারেটের প্রতিটি ঘটনা। সহবাসের কথাও বাদ যায়নি এতে পিটারের সঙ্গে। সেই সন্দেহ এবার সত্যি প্রমাণিত হল যা এতদিন নিছক সন্দেহ ছিল। এরপর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল হ্যারিয়েট। চরম পথ বেছে নিল শেষ পর্যন্ত। ঘুমের ট্যাবলেট একটার পর একটা খেয়েছিল রাতে চিঠি লেখার পর। ওর সেই ঘুম আর ভাঙেনি চিরদিনের মত।

প্রথমটা অস্বস্তি হত কয়েদির পোষাকে পিটারের। ব্যাপারটা অনেকটা সহ্য হয়েছে মাস তিনেক কাটার পর। পিটার দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর ভাবে যে হ্যারিয়েট নতুনভাবে বাঁচতে

চেয়েছিল ওকে ভালবেসে এবং ওকে অবলম্বন করে, ওর মন বেদনায় ভরে ওঠে এই কথা ভাবতে গিয়ে।

বোম্বে হাইকোর্টে বিচার হয়েছিল পিটারের। মন রীতিমতো বেদনায় ভরে উঠে যখন মনে পড়ে বিচারের দিনগুলোর কথা। ফ্রেডির সঙ্গে মার্গারেটকে কোর্টে দেখেছিল দীর্ঘকাল পরে। দারুণ সুন্দরী লাগছিল মার্গারেটকে। মার্গারেট পরেছিল নীল রঙের নক্সা করা সাদা গাউন, ওকে লাগছিল দারুণ সুন্দরী। ওদের বিয়ে হয়ে গেছে, কারণ এনগেজমেন্ট রিং ও দেখতে পেয়েছে মার্গারেটের হাতে। চেহারা আরো ভাল হয়েছে। পেট ফুলে উঠেছে কারণ আর বেশী দেরী নেই সন্তানের জন্মের। ফ্রেডিই এই সমস্ত ব্যাপারের মূলে দায়ী যে তা বুঝতে পেরেছিল পিটার। আসামীর কাঠগড়া থেকে দেখেছিল ফ্রেডিকে। চোখে চশমা পরা ছিল ওর। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য শান্ত ধীর স্থির চোখে। পিটারের কোনো ঈর্ষা হয়নি বরং দুঃখবোধে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল ওর মন। পিটার ওর দিকে একবারই তাকিয়েছিল যখন কাঠগড়ায় ডাকা হয়েছিল মার্গারেটকে সাক্ষী হিসাবে। মুখমণ্ডলে প্রশান্তির ভাব এবং লাবণ্য আরো বেড়েছে। তবুও কোথায় যেন একটা বিষণ্ণতা। মার্গারেট চোখ নামিয়ে নিয়েছিল একবার পিটারের দিকে তাকিয়ে। পিটার এই প্রথম দেখলো মার্গারেটকে, ওর চলে যাবার পর। যে প্রিয়তমাকে ও একান্ত আপন করে পেতে চেয়েছিল সেই আজ তার বন্ধু অন্য পুরুষের সঙ্গে। জেল থেকে বেরিয়ে ওর সঙ্গে ও শেষ বোঝাপড়া করবে কারণ ফ্রেডি ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

পিটারের এখন কিছুই করার নেই। অনন্ত সময় ওর জেলের ভিতর। নিয়মিত খবরের কাগজ এবং কিছু বই ও একটি বাইবেল পেয়েছে ও জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। পিটার মনে মনে প্রায়শ্চিত্ত করে, বাইরের খোলা আকাশ যখন রোদে ঝলমল করে।

কাশ্মীর থেকে লেখা একটি চিঠি পিটার পেলো কারাবাসের ঠিক মাসখানেকের মাথায় একদিন বিকালে। মার্গারেট লিখেছে জেলের ঠিকানাতেই। পিটার ভাবতেই পারেনি যে মার্গারেট ওকে চিঠি লিখতে পারে। পিটার পড়ল চিঠিখানা খুলে।

প্রিয় পিটার,

তুমি ভালো আছো আশা করি, তোমার মঙ্গল করবেন ঈশ্বর। ফ্রেডিকে আমি ভালবাসি তাই আমি ফ্রেডির সঙ্গে পালিয়ে এসেছি। এই ভালবাসা সত্যিকারের ভালবাসা। আমি তোমার খারাপ ব্যবহারের পরও সহ্য করেছি সবকিছু কারণ আমার গর্ভের সন্তান ওর। সন্তান নষ্ট করিনি আমি কারণ ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল বরাবরই। চিঠি লিখতাম আমরা দুজনে দুজনকে, তাই কিছু গোপন করিনি ওর কাছে। ওর সামনেই তাই চিঠি লিখছি। ভিক্টরের ঠিকানায় চিঠি দিত ফ্রেডি। দুজনে দেখাও করেছি আমরা কলকাতায় মাঝে মাঝে। এসব তোমাকে লুকিয়ে করতে হয়েছে কারণ তুমি এর কিছুই মেনে নিতে পারতে না। কোনোদিনই তুমি আমার মনকে বোঝনি, বরাবর দেহ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছ। ফ্রেডি আমাকে বিয়ে করেছে ও স্বীকৃতি দিয়েছে আমার সন্তানকে। ওরই সন্তান। ও প্রথমে চায়নি আমিই চেয়েছিলাম, ও ওর বিবেকের অনুশোচনার কথা জানিয়েছে এই ঘটনার পর যতবারই ও চিঠি লিখেছে।

ভারতে আমি জন্মেছি যেহেতু তাই তুমি আমায় অনায়াসে ভারতীয় বলতে পারো। আমি বিশ্বাসী এখানকার দর্শনে। এখানকার মেয়েরা সারাজীবন স্বামী আর ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখে কাটিয়ে দিতে চায়। এদের একমাত্র কাম্য নয় বিভিন্ন পুরুষের কাছে দেহসুখ পাওয়া। আমি যেহেতু নিজেকে ভারতীয় নারী বলেই ভাবি তাই আমিও এর ব্যতিক্রম

নই। ফ্রেডিকে আমি তা বলাতে ও মেনে নিয়েছে। ভারতীয় দর্শনে ও ভীষণ অনুরাগী এবং অনেক কিছু শিখিয়েছে ও আমাকে। এখন আমি একেবারেই তা নই আগে যা ছিলাম। আমি ভাবিনি যে আমি এত ধীর স্থির হয়ে যাব, যে আগে এত চঞ্চল স্বভাবের ছিল।

কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি আমরা দুজন। এ জায়গাটাকে যে পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গ বলা যায় তা যে কতটা সত্যি তা আমি বুঝতে পারছি। ভাবতে পারিনি যে আমাদের হানিমুন এত সুন্দর আর রমনীয় জায়গায় হবে। যত দেখছি নতুন করে বাঁচার সুখ খুঁজে পাচ্ছি। সন্তান হবে আমার আর কয়েক মাস পর, ও যেন ফ্রেডির মত হয় তুমি সেই আশীর্বাদ ওকে কর।

ফ্রেডির কোনো অভিযোগ নেই তোমার উপরে। ও পড়াশোনা করেছে মনোবিজ্ঞান নিয়ে। মানুষ যে রক্তের প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারে না সেটাই ওর বিশ্বাস। ও ভাগ্যে বিশ্বাসী। বিজ্ঞান শেষ কথা নয় তার বাইরে আরো কিছু আছে। কে জানে আমরা সেখানে আদৌ পৌঁছব কি পৌঁছব না। বিজ্ঞানকে অবশ্য এ সব কথার জন্য অস্বীকার করা যায় না। আমি কিভাবে শিখলাম এসব জবর কথা সেটা হয়তো তুমি ভাবছো। আমি বলতে পারি এই সব শিখেছি ফ্রেডির উৎসাহে। আমি ধন্য যে ফ্রেডি আমাকে গ্রহণ করেছে। আমি এখন খুব সুখী, তোমার মঙ্গল কামনা করি ঈশ্বরের কাছে।
–তোমার মিমি।

পিটারের দুচোখ ঝাপসা যখন চিঠি শেষ করল। ওর নিজেকে প্রচণ্ড মুক্ত মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে। কোনো বন্ধন নেই। কোনো দুঃখ নেই এই মুহূর্তে পিটারের। সে বাইরের

নীল আকাশের দিকে তাকাল গরাদের ফাঁক দিয়ে। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, মিমি, আমার মার্গারেট, সুখে থাকো তুমি, সুখী হোক তোমাদের বিবাহিত জীবন।

পাখিদের ঘরে ফেরার পালা তখন বাইরের নীল দিগন্ত জুড়ে।